শহীদ কাদরীর
কবিতা

শহীদ কাদরীর কবিতা

সাহিত্য প্রকাশ

প্রচ্ছদ : আলোক কর্মকার
চতুর্থ মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৬, জানুয়ারি ২০১০
তৃতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৩, ফেব্রুয়ারি ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯৯, জানুয়ারি ১৯৯৩
ISBN 984-465-006-2

মূল্য : একশত ষাট টাকা

প্রকাশক : মফিজুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকের নিবেদন

বরাবরই বিরলপ্রজ লেখক শহীদ কাদরী, তার ওপর দীর্ঘকাল যাবৎ রয়েছেন স্বদেশ থেকে দূরে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। বাংলা কবিতার অতি সাম্প্রতিক সৃষ্টি প্রাচুর্যের ভিড়ে তাঁকে কেউ খুঁজে পাবেন না। অথচ সাতচল্লিশ-উত্তর কবিতাধারায় আধুনিক মনন ও জীবনবোধ সঞ্চারিত করে কবিতার রূপবদলের যাঁরা ছিলেন কারিগর, শহীদ কাদরী তাঁদের অন্যতম প্রধান। তাঁর কবিতা আমাদের নিয়ে যায় সম্পূর্ণ আলাদা এক জগতে, ঝলমলে বিশ্ব-নাগরিকতা বোধ ও গভীর স্বাদেশিকতার মিশেলে শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্বে তিনি যেন বিদ্যুচ্চমকের মতো এক ঝলকে সত্য উদ্ভাসন করে পর মুহূর্তে মিলিয়ে গেলেন দূর দিগন্তের নিভৃত নির্জনতার কোলে।

আমাদের পরম গর্ব ও আনন্দের বিষয় নিভৃতি ও দূরত্বের বাধা অপসারণ করে দীর্ঘকাল ধরে অমুদ্রিত তাঁর কাব্যগ্রন্থত্রয়ী আবার পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমোদন তিনি আমাদের দিয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক এক পত্র :

"জ্যোতি [জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত] তোমার চিঠি পড়ে শোনালো টেলিফোনে। বলাবাহুল্য আমার সঙ্গে কারুরই যোগাযোগ নেই। ঢাকার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সাড়াশব্দ পাওয়ার আশা অনেকদিন আগেই ত্যাগ করেছি। আমি জানি, আমার বন্ধুরা আমার মতোই 'জাড্যের ভারে শিথিল', আড্ডা ও আলস্যের সানন্দ শিকার। তবু বাংলাদেশের রঙ-বেরঙের দৃষ্টিরঞ্জনকারী ডাকটিকিটধারী পত্র পেতে আমার যে দারুণ ইচ্ছে করে না, তা নয়। অতীতে কৃচিৎ কখনো ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের চিঠি হাতে এসেছে—ডাকের মাশুল দেখে আমি চমকে উঠেছি। ঈশ্বর - পরিত্যক্ত এই শীতার্ত মার্কিন মুল্লুকে চিঠি পাঠাতে দশ-পনেরো টাকা গচ্চা দিতে হয়। তত্রাচ, চিঠি পেতে ভালো লাগে : ভাবতে ইচ্ছে করে যে স্বদেশ থেকে দূরে হলেও, স্বজনদের স্মৃতি থেকে একেবারে সমূল নির্বাসিত হই নি এবং আমার স্বজন আমার বন্ধুরাই।

"আমার তিনটে বই নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ বের করার যে প্রস্তাব তুমি দিয়েছো, তাতে আমার সানন্দ সম্মতি রয়েছে। তবে মাত্র তিনখানা অপুষ্ট ক্ষীণ কলেবরের বই নিয়ে মহাকালের দ্বারে কড়া নাড়ার যে আগ্রহ আমি প্রকাশ করলাম তা আকাট মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।"

শহীদ কাদরীর কবিতা মূল্যায়নের কাজ পাঠকেরাই করবেন। তাদের হাতে সমুদয় কবিতাবলীর পরিচয় তুলে ধরতে পারার মধ্যেই আমাদের করণীয় সমাপ্ত হচ্ছে।

মফিদুল হক

ঢাকা

ডিসেম্বর, ১৯৯২

উত্তরাধিকার

বৃষ্টি, বৃষ্টি ১১
নপুংসক বস্তুর উক্তি ১৪
টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব ১৬
আমি কিছু কিনবো না ১৭
নশ্বর জ্যোৎস্নায় ১৯
মৃত্যুর পরে ২০
প্রেমিকের গান ২১
উত্তরাধিকার ২২
সঙ্গতি ২৪
স্মৃতি : কৈশোরিক ২৫
জানালা থেকে ২৬
পাশের কামরার প্রেমিক ২৮
কবিতাই আরাধ্য জানি ২৯
নিরুদ্দেশ যাত্রা ৩০
প্রিয়তমাসু ৩২
অলীক ৩৩
পরস্পরের দিকে ৩৪
সমকালীন জীবনদেবতার প্রতি ৩৫
নগ্ন ৩৭
দুই প্রেক্ষিত ৩৮
মোহন ক্ষুধা ৩৯
বিপরীত বিহার ৪০
নিসর্গের নুন ৪১
ইন্দ্রজাল ৪৩
ভরা বর্ষায় : একজন লোক ৪৫
আলোকিত গণিকাবৃন্দ ৪৭
অবিচ্ছিন্ন উৎস ৪৮
পতন ৪৯
চন্দ্রালোকে ৫০
এই শীতে ৫১
নির্বাণ ৫২
শত্রুর সাথে একা ৫৪
কবি-কিশোর ৫৫
জন্মবৃত্তান্ত ৫৬
নর্তকী ৫৭
আমন্ত্রণ : বন্ধুদের প্রতি ৫৮
দয়ার্দ্র কানন ৫৯
চন্দ্রাহত সাক্ষাৎ ৬০
ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাবো ৬১
অগ্রজের উত্তর ৬২

তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা

রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট ৬৫
সেলুনে যাওয়ার আগে ৬৭
শেষ বংশধর ৬৯
অন্য কিছু না ৭১
স্কিৎসোফ্রেনিয়া ৭৩
একবার শানানো ছুরির মতো ৭৫
বৈষ্ণব ৭৬
রবীন্দ্রনাথ ৭৭
বাংলা কবিতার ধারা ৭৯
কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার ৮০
নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে ৮২
মাংস, মাংস, মাংস ৮৪
পাখিরা সিগন্যাল দেয় ৮৫
গোলাপের অনুষঙ্গ ৮৬
ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায় ৮৭
স্বাধীনতার শহর ৮৮
নীল জলের রান্না ৮৯
রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন ? ৯০
হে হিরণ্ময় ৯২

বন্ধুদের চোখ ৯৩
ছুরি ৯৫
এই সব অক্ষর ৯৬
গাধা-টুপি প'রে ৯৭
আইখম্যান আমার ইমাম ৯৯
যুদ্ধোত্তর রবিবার ১০১
গোধূলি ১০৩
টাকাগুলো কবে পাবো ? ১০৪
একুশের স্বীকারোক্তি ১০৬
একদার দূর বাল্যকালে ১০৮
জন্মগৃহ ১০৯
তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা ১১১

কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই

আজ সারাদিন ১১৫
কেন যেতে চাই ১১৭
প্রেম ১১৯
'সঙ্গতি' ১২০
একটা মরা শালিক ১২১
বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলী ১২৪
তুমি গান গাইলে ১২৫
প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে ১২৭
কে যেন বলছে ১২৮
আমি নই ১৩০
অটোগ্রাফ দেয়ার আগে ১৩১
নর্তক ১৩৩
শীতের বাতাস ১৩৪
মৃত্যুর প্রাঞ্জল শিল্প ১৩৫
কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না ১৩৬
আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম ১৩৭
উত্থান ১৩৯
চাই দীর্ঘ পরমায়ু ১৪১
একটা দিন ১৪২
এবার আমি ১৪৩
এক চমৎকার রাত্রে ১৪৪
কোনো কোনো সকালবেলায় ১৪৮
যাই, যাই ১৫০
মৎস্য-বিষয়ক ১৫১
আর কিছু নয় ১৫৩
খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম ১৫৪
বালকেরা জানে শুধু ১৫৬
জীবনের দিকে ১৫৮
মানুষ, মানুষ ১৫৯
এ-ও সঙ্গীত ১৬০
একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল ১৬২
ধূসর জল থেকে ১৬৬
বোধ ১৬৭
একটি উত্থান-পতনের গল্প ১৬৮
দাঁড়াও আমি আসছি ১৭৩

উত্তরাধিকার

উৎসর্গ

অগ্রজ শাহেদ কাদরী

প্রকাশকাল : ১৯৬৭

বৃষ্টি, বৃষ্টি

সহসা সন্ত্রাস ছুঁলো। ঘর-ফেরা রঙিন সন্ধ্যার ভীড়ে
যারা ছিলো তন্দ্রালস দিগ্বিদিক ছুটলো, চৌদিকে
ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আর্‌শোলার মত যেনবা মড়কে
শহর উজাড় হবে,—বলে গেল কেউ—শহরের
পরিচিত ঘন্টা নেড়ে নেড়ে খুব ঠাণ্ডা এক ভয়াল গলায়

এবং হঠাৎ
সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে
বিদ্ধ হলো বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম !
বজ্র-শিলাসহ বৃষ্টি, বৃষ্টি : শ্রুতিকে বধির ক'রে
গর্জে ওঠে যেন অবিরল করাত-কলের চাকা,
লক্ষ লেদ-মেশিনের আর্ত অফুরন্ত আবর্তন !

নামলো সন্ধ্যার সঙ্গে অপ্রসন্ন বিপন্ন বিদ্যুৎ
মেঘ, জল, হাওয়া,—
হাওয়া, ময়ূরের মতো তার বর্ণালী চিৎকার,
কী বিপদগ্রস্ত ঘর-দোর,
ডানা মেলে দিতে চায় জানালা-কপাট
নড়ে ওঠে টিরোনসিরসের মতন যেন প্রাচীন এ-বাড়ি !
জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় জনারণ্য, শহরের জানু
আর চকচকে ঝলমলে বেসামাল এভিনিউ

এই সাঁঝে, প্রলয় হাওয়ার এই সাঁঝে
(হাওয়া যেন ইস্রাফিলের ওঁ)
বৃষ্টি পড়ে মোটরের বনেটে টেরচা,
ভেতরে নিস্তব্ধ যাত্রী, মাথা নীচু
ত্রাস আর উৎকণ্ঠায় হঠাৎ চমকে
দ্যাখে,—জল,
অবিরল

জল, জল, জল
তীব্র, হিংস্র
খল,
আর ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় শোনে
ক্রন্দন, ক্রন্দন
নিজস্ব হৃৎপিণ্ডে আর অদ্ভুত উড়োনচণ্ডী এই
বর্ষার উষর বন্দনায়

রাজত্ব, রাজত্ব শুধু আজ রাতে, রাজপথে-পথে
বাউণ্ডুলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের, উন্মূল, উদ্বাস্তু
বালকের, আজীবন ভিক্ষুকের, চোর আর অর্ধ-উন্মাদের
বৃষ্টিতে রাজত্ব আজ। রাজস্ব আদায় করে যারা,
চিরকাল গুণে নিয়ে যায়, তারা সব অসহায়
পালিয়েছে ভয়ে।

বন্দনা ধরেছে, —গান গাইছে সহর্ষে
উৎফুল্ল আঁধার প্রেক্ষাগৃহ আর দেয়ালের মাতাল প্ল্যাকার্ড,
বাঁকা-চোরা টেলিফোন-পোল, দোল খাচ্ছে ওই উঁচু
শিখরে আসীন, উড়ে-আসা বুড়োসুড়ো পুরোন সাইনবোর্ড
তাল দিচ্ছে শহরের বেশুমার খড়খড়ি
কেননা সিপাই, সান্ত্রী আর রাজস্ব আদায়কারী ছিল যারা,
পালিয়েছে ভয়ে।

পালিয়েছে, মহাজ্ঞানী, মহাজন মোসাহেবসহ
অন্তর্হিত,
বৃষ্টির বিপুল জলে ভ্রমণ-পথের চিহ্ন
ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে
কেবল করুণ ক'টা
বিমর্ষ স্মৃতির ভার নিয়ে সহর্ষে সদলবলে
বয়ে চলে জল পৌরসমিতির মিছিলের মতো
নর্দমার ফোয়ারার দিকে,—

ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো বেজে সিগারেট-টিন
ভাঙা কাঁচ, সন্ধ্যার পত্রিকা আর রঙিন বেলুন
মসৃণ সিল্কের স্কার্ফ, ছেঁড়া তার, খাম, নীল চিঠি

লণ্ড্রির হলুদ বিল, প্রেসক্রিপসন, শাদা বাক্সে ওষুধের
সৌখীন শার্টের ছিন্ন বোতাম ইত্যাদি সভ্যতার
ভবিতব্যহীন নানাস্মৃতি আর রঙবেরঙের দিনগুলি

এইক্ষণে আঁধার শহরে প্রভু, বর্ষায়, বিদ্যুতে
নগ্নপায়ে ছেঁড়া পাৎলুনে একাকী
হাওয়ায় পালের মতো শার্টের ভেতরে
ঝকঝকে, সদ্য, নতুন নৌকোর মতো একমাত্র আমি,
আমার নিঃসঙ্গে তথা বিপর্যস্ত রক্তেমাংসে
নূহের উদ্দাম রাগী গরগরে লাল আত্মা জ্বলে
কিন্তু সাড়া নেই জনপ্রাণীর অথচ
জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাসের স্বর, বাতাসে চিৎকার,
কোন আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে, কোন শহরের দিকে
জলের আহ্লাদে আমি একা ভেসে যাবো ?

নপুংসক সন্তের উক্তি

শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্রবিন্দুর স্বাদে
রুচি নাই, ততটাই বিমুখ আমরা বন্ধুদের
উজ্জ্বল সাফল্যে অলৌকিক। কে গেল প্রাসাদে আর
সেই নীল গলির গোলকধাঁধা কার চোখে, ঈর্ষায় কাতর

কেবা (হয়তো-বা আমরাও)। দ্রুত তিমিরে তলাবে
গদ্যের বদলে যারা সুললিত পদ্যে সমর্পিত—
টেরী কাটা মসৃণ চুলের কবি, পাজামা-পাঞ্জাবি
হাওয়ায় উড়িয়ে হাঁটে তারা আজীবন নিশ্চিন্তে নরক-ধামে,

এবং চৈতন্যে নেই অবিরাম অনিশ্চিত, অশেষ পতন
পলে-পলে স্খলনের অঙ্গীকার আর অনুর্বর মহিলার
উদরের মত আর্ত উৎকণ্ঠিত, আবর্তিত শূন্যতার ভার,
নেই এই ভীড়াক্রান্ত, বিব্রত, বর্বর উর্ধ্বশ্বাস শহরের

তীক্ষ্ণধার জনতা এবং তার একচক্ষু আশার চিৎকার!
পূর্ণিমা-প্রেতার্ত তারা নির্বীজ চাঁদের নীচে, গোলাপ বাগানে
ফাল্গুনের বালখিল্য চপল আঙুলে, রুগ্নউরু প্রেমিকার
নিঃস্বপ্ন চোখের 'পরে নিজের ধোঁয়াটে চোখ রাখে না ভুলেও,

কম্পমান অবিবেকী হাতে গুঁজে দেয় ম্লান ফুল
পীতাভকুন্তলে তার, প্রথামতো সেরে নেয় কবির ভূমিকা,
ইতিহাসের আবহে নাকি আজ এ সকলই ঐতিহ্যসম্মত, —
এই নির্বোধ আনন্দ-গান, ওই অনাত্ম উৎসব!

আমরাই বিকৃত তবে? শান্ত, শুদ্ধ এই পরিবেশে
আতর লোবান আর আগরবাতির অতিমর্ত্য গন্ধময়
দেবতার স্পর্শ-পাওয়া পবিত্র গ্রন্থের উচ্চারণে

প্রতিধ্বনিময় শস্যক্ষেতের উদার পরিবেশে

সুপ্রচুর বিমুক্ত হাওয়ায় কেন তবে কষ্টশ্বাস ?
কেন এই স্বদেশ-সংলগ্ন আমি, নিঃসঙ্গ, উদ্বাস্তু,
জনতার আলিঙ্গনে অপ্রতিভ, অপ্রস্তুত, অনাত্মীয় একা,
আঁধার টানেলে যেন ভূ-তলবাসীর মতো, যেন

সদ্য উঠে-আসা কিমাকার বিভীষিকা নিদারুণ !
আমার বিকট চুলে দুঃস্বপ্নের বাসা ? সবার আত্মার পাপ
আমার দু'চোখে শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমার মতো লেগে আছে ?
জানি, এক বিবর্ণ গোষ্ঠীর গোধূলির শেষ বংশজাত আমি,

বস্তুতই নপুংসক, অন্ধ, কিন্তু সত্যসন্ধ দুরন্ত সন্তান !
আমাকে এড়ায় লোকে, জাতিস্মর অবচেতনার পরিভাষা
যেহেতু নিয়েছি আজ নিষ্করুণ আর্তস্বরে সাহসীর মতো,
তাই অগ্রজের আয়োজন শুরু হয় বধ্যভূমির চৌদিকে

আমাকে বলির পশু জেনে নিয়ে, উজ্জ্বল আতসবাজি আর
বিচিত্র আলোক সাজে ঢেকে দিয়ে রাত্রির আকাশ
দেখায় আবার তেল্কি কাড়া-নাকাড়ায় সাড়া তুলে
যূথচারী মানুষেরে! এবং আমার শরীরের শস্যক্ষেতে
অসীম উৎসাহভরে একটি কবর খুঁড়ে রাখে।

টেলিফোনে, আরক্ত প্রস্তাব

কালো ডায়ালে আমার আঙুলে ঐন্দ্রজালিক
ঘুরছে নম্বরগুলি,—
শহরের ওপর থেকে
দূরদর বাস গাড়ি ঘন্টাধ্বনি তরঙ্গিত ঘাসে-ভরা
স্টেডিয়ামের ওপর থেকে
আসছে :
'না, না, না'— কী জ্যোৎস্না কণ্ঠস্বরে !
কত কাঁপন চিকন কালো তারে !
আমি ঠিক জানি চড়ুইপাখির মতো ঠোঁটজোড়া কাঁপছে,
'না, না, না'

কোন কিছুই লাল কার্পেটের মেঝে থেকে
নামাতে পারবে না, দীর্ঘ, সরু, পিচ্ছিল রাস্তায়
কত ধাপ ভাঙতে হবে
কত জটিল সরুগলি, সিঁড়ির মোড়, পার্ক, কাঁটাবেড়া
জরায়ুর মত কুব্জপীঠে কি সব রেস্তোরাঁ

পরিশ্রম সাপেক্ষ মিলনের সবকটি মুহূর্ত,
সব ফুৎকার সযত্ন, নরম—যাতে ফুটে ওঠে বেলুন,
সবরকম সতর্ক সজ্ঞান ব্যবহার, যাতে ফাটে না গেলাস

আর ঐ ডাকসাটে লাল ঘোড়া
যদি ধ'রে ফেলে এই কামরায় গোধূলিকে ছত্রখান করে,
'না, না, না'

আমি জানি চড়ুইপাখির মত ঠোঁটজোড়া কাঁপছে ।

আমি কিছুই কিনবো না

ঢিলে-ঢালা হাওয়ায়-ফোলানো ট্রাউজার, বিপর্যস্ত চুলে
উৎসবে, জয়ধ্বনিতে আমি
ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে, বিজ্ঞাপনের লাল আলোয়
সতেজ পাতার রঙ সেই বিজয়ী পতাকার নীচে
কিছুক্ষণ, একা
নতুন, সোনালি পয়সার মতন দুই পকেট ভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার
আর জ্যোৎস্নার চকিত ঝলক আমার
ঝলসানো মুখের অবয়বে
সিনেমায় দীর্ঘ কিউ-এর-সামনে আমি
নব্য দম্পতির গা ঘেঁষে

চারিদিকে রঙবেরঙের জামা-কাপড়ের দোকান
মদিরার চেয়ে মধুর সব টেরিলিনের শার্ট
ভোরবেলার স্বপ্নের চেয়ে মিহি সূক্ষ্ম সুতোর গেঞ্জি
স্বপ্নাক্রান্ত বালকের হাতেরও অধিক অস্থির
রজ্জুতে-গাঁথা রাশি রাশি, পুঞ্জ পুঞ্জ লাল, নীল উজ্জ্বল রুমাল
মেঘলোকে মজ্জমান রেস্তোরাঁর দ্বারগুলো খোলা—
আমি অবহেলে চলে যাবো, যাই
আঁধার রাস্তার রানী চকোরীর মত বাঁকা চোখে দ্যাখে
—আমি কিছুই কিনবো না!

নিরন্তর গাড়িগুলো পার্ক-করা নির্দিষ্ট রাস্তার বাঁকে
সিনেমার কিউ ধ'রে অনন্তকাল আমি
আমার ইয়ার্কি আর মস্কারা
ইন্দ্রধনু রঙের সরু বেল্ট্ নিয়ে অফুরন্ত দরাদরি
—আমি কিছুই কিনবো না।

আমাকে পেছনে রেখে চলে যায় সারে-সারে কত ক্লার্ক

আঙুলে কালির দাগ, মুখে ভয়
টাইপরাইটারে ছাওয়া সারা দেশ, কি মুখর, উন্মুখর
কত না রঙ্গ জানে শো-কেসের সাজানো শেমিজ, শাড়ি
ঝলমলে ছোটবড় ঘড়ি
তিনজন অন্ধবুড়ো জ্যোৎস্নাভরা মাঠে কী কৌতুকে
গালমন্দ পাড়ে
গান ধরে অন্ধকার গলি, 'হে প্রেম, হে আমার প্রেম।'
পার্কের রেলিঙে বসে-থাকা বধির পাগলের অট্টহাসিতে
ধ্বংসের খরতাল বুঝি বাজে
তবু ম্লান আলোর নীচে দীপ্তিমান জ্বলজ্বলে কমলা
আর আপেলের ঝুড়ি
আর আমার পকেটভর্তি স্বপ্নের ঝনৎকার
জয়ধ্বনি থেকে ক্রন্দনে আমি
উদ্ধত পতাকার নীচে একা, জড়োসড়ো—
—আমি কিছুই কিনবো না।

নশ্বর জ্যোৎস্নায়

জ্যোৎস্নায় বিব্রত বাগানের ফুলগুলি, অফুরন্ত
হাওয়ার আশ্চর্য আবিষ্কার করে নিয়ে
চোখের বিষাদ আমি বদ্‌লে নি' আর হতাশারে
নিঃশব্দে বিছিয়ে রাখি বকুলতলায়
সেখানে একাকী রাত্রে, বারান্দার পাশে
সোনালি জরির মতো জোনাকিরা নক্সা জ্বেলে দেবে,

টলটল করবে কেবল এই নক্ষত্রের আলো–জ্বলা জল
অপ্সরার ওষ্ঠ থেকে খসে–পড়া চুম্বনের মতো
তৃষ্ণা নেভানোর প্রতিশ্রুতিতে সজল
এই আটপৌরে পুকুরেই
শামুকে সাজাবে তার আজীবন প্রতীক্ষিত পাড়।

আমার নির্বেদ কোন বালকের ব্যগ্র আঙুলের মতো
আদর জানাবে শাদা, উষ্ণ রাজহাঁসের পালকে,
অবিশ্বাস, মখমলের কালো নক্ষত্র–খচিত টুপি প'রে
সশব্দে দরোজা খুলে এক–গাল হাওয়া খেয়ে বেড়াবে বাগানে

পরিত্যক্ত মূল্যবোধ, নতুন ফুলের কৌটোগুলো
জ্বলজ্বলে মনির মতন সংখ্যাহীন জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে
নিঃশব্দে থাকবে ফুটে মধ্য–বিশ শতকের ক্লান্ত শিল্পের দিকে চেয়ে
—এইমতো নির্বোধ বিশ্বাস নিয়ে আমি
বসে আছি আজ রাত্রে বারান্দার হাতল–চেয়ারে
জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়।

মৃত্যুর পরে

রয়ে যাই ঐ গুল্মলতায়,
পরিত্যক্ত হাওয়ায়–ওড়ানো কোন হলুদ পাতায়,
পুকুর পাড়ের গুগ্‌গুলে,
একফোঁটা হন্তারক বিষে, যদি কেউ তাকে পান করে ভুলে,
অথবা সুগন্ধি কোন তেলের শিশিতে,
মহিলার চুলে,
গোপনে লুকিয়ে থাকি যেন তার ঘুমের নিশীথে
অন্তত নিদেনপক্ষে একলাফে পেরিয়ে দেয়াল
পৌছে যেতে পারি যেন আমার কবরে আমি জ্বলন্ত শেয়াল
সন্তর্পণে নাকে শুঁকে রাত্রির নিঃশব্দ মখমলে
আমার টাটকা শব ফেরে যেন আমারই দখলে
বিঘ্নহীন, রক্তমাংস হাড়গোড় চেটেপুটে সবই খাওয়া হয়
নিজেই বাঁচাতে যেন পারি ওহে, নিজেরই নেহাৎ
ব্যক্তিগত অপচয় ॥

প্রেমিকের গান

ধনুকের মত টংকার দিল টাকা
তোমার উষ্ণ, লাল কিংখাবে ঢাকা
উজ্জ্বল মুখ যেনবা পয়সা সোনালি রূপালি তামা

পরপর দেখি বেজে চলে যায় নিত্য
পরিবর্তিত তোমার মুখের সারি
দেখেও দেখি না চিনি তবু বিদেশিনী

প্লাটিনাম সে কি দস্তা কিংবা তামা
নাকি সে নকল তারা
মঞ্চের কালো পর্দার পর রূপার চুম্‌কি তুমি

মনে হয় যেন বার্মা টিকের নিপুণ পালিশ,
সেগুন কাঠের ওয়ার্ডরোব
গিলে খাবে বুঝি পৃথিবীর সব

সোনালি, রূপালি শাড়ি
ওগো কি সূক্ষ্ম তোমার চিকণ ক্ষুধা
স্যাটিন কিংবা শীফন ব্যতীত সোনামুখ যেন তামা

ভয়াল, হিংস্র তোমার মুখের সারি
লৌহ কঠিন বিশাল উদর খোলা যেন সিন্দুক
ভরে দেবো সোনাদানা॥

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে —
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগ্‌রে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু, রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউটে আঁধারে।

কাঁটা-তারে ঘেরা পার্ক, তাঁবু, কুচকাওয়াজ সারিবদ্ধ
সৈনিকের। হিরণ্ময় রৌদ্রে শুধু জ্বলজ্বলে গম্ভীর কামান,
ভোরবেলা সচকিত পদশব্দে ঝোড়ো বিউগুলে
গাছ-পালা, ঘরবাড়ি হঠাৎ বদলে গেছে রাঙা রণাঙ্গনে।

শৃংখলিত, বিদেশীর পতাকার নীচে আমরা শীতে জড়োসড়
নিঃশব্দে দেখেছি প্রেমিকের দীপ্ত মুখ থেকে জ্যোতি ঝরে গেছে
ম্লানমুখো ফিরেছে বালক সমকামী নাবিকের
মরিয়া উল্লাস ধ্বনি আর অশ্লীল গানের কলি

নীর পালকের মত কানে গুঁজে, একা সাঁঝবেলা।
যীশুখৃষ্টের মতন মুখে সৌম্য বুড়ো সয়ে গেছে
ল্যান্টর্নের ম্লান রাত্রে সৈনিকের সিগারেট, রুটি, উপহার
এবং সঙ্গম-পিষ্ট সপ্তদশী অসতর্ক চিৎকার কন্যার।

রক্তপাতে, আর্তনাদে, হঠাৎ হত্যায় চঞ্চল কৈশোর-কাল
শেখালে মারণ-মন্ত্র,— আমার প্রথম পাঠ কি করে যে ভুলি,
গোলাপ-বাগান জুড়ে রক্তে-মাংসে পচেছিলো একটি রাঙা বৌ
ক'খানা ছকের ঘুঁটি মানুষের কথামতো মেতেছিলো বলে।

ছদ্মবেশী সব মুখ উৎসবে লেগেছে ফের, ফেনিল উৎসবে,
কী শান্ত নরম গলা, সন্ধ্যার হাওয়ায় বসে আছে
দু'দিন আগের মুখ, ভালোবাসা-স্তব্ধ-করা আততায়ী-মুখ

সন্তর্পণে নিয়েছে গুটিয়ে যেন আস্তিনের সাথে,

যেন কেউ কামমত্ত ভালুকের মতো করে নাই ধাওয়া কোন
মহিলারে পাতালে নাবানো ঠাণ্ডা কূপের গহ্বরে,
সূর্যাস্তে নির্ভার মনে যেন শোনে নি বোমারু শিস্
হঠাৎ কৃষক, দূরে দাউদাউ অন্তিম আগুন তার পড়শির গ্রামে,

লুটিয়ে পড়ে নি কেউ স্বদেশী পার্কের ছবি হাতে
বিদেশীর গমক্ষেতে বাসিমুখে কফির বাটিতে মুখ রেখে।
বালকের মুঠো থেকে খসে গেছে হালকা সূক্ষ্ম সুতো বেলুনের
অচেনা দুর্বোধ্য ত্রাসে, আমার চোখের নীচে, এভেন্যুর ধারে,

নির্বোধের আলস্যে কেবল ম্লান হাস্যে জানিয়েছি
মনোরম অন্তরাগে শুধু আমার গোধূলি-ভাষ্য
মূল্যবোধের আর যা কিছু সত্য তাই হতাশার
পরম, বিশ্বস্ত অনুগামী, প্ররোচক বুঝি স্বেচ্ছামরণের,

—এইমতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
এবং আমাকে নিষ্কপর্দক, নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
ক'রে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা!
আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো

বিপদ-সংকেত জ্বেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো
অনিদ্রায়।

সঙ্গতি

আমরা কাতারে–কাতারে দাঁড়িয়ে আছি ব্যক্তিগত
দূরত্বে
সবাই। নামহীন অহংকারে হলুদ একসার বিকৃত
মুখ
পরস্পর থেকে ফেরানো; হৃৎপিণ্ডের মধ্যে লুকোনো
নিতান্ত নিজস্ব
কাঁচ,—সেখানেই উৎসুক ফিরে ফিরে তাকানো।

কিন্তু সন্ধ্যার নির্বোধ হাওয়া জমিয়ে তুললো
একটি সাধারণ পরিমল,—এ যখন ও–র গন্ধে সজাগ,
আমরা প্রত্যেকে ভ্রূ-কুঁচকে যাই–যাই, তখনি সে এসে দাঁড়ালো
স্কার্ট–ঢাকা সোনালি চুলের ইন্দ্রজালে দীর্ঘ, ঋজু ক্ষীণ উরুর বিদেশিনী
আমরা তাকে ঘিরে ভিখিরির মত গুঞ্জন রটালাম।

স্মৃতি : কৈশোরিক

অদৃশ্য ফিতে থেকে ঝুলছে রঙিন বেলুন
রাত্রির নীলাভ আসঙ্গে আর স্বপ্নের ওপর
যেন তার নৌকো– দোলা; সোনার ঘন্টার ধ্বনি
ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত শহরের। আমি ফিরলাম
ঝর্ণার মত সেই গ্রীষ্ম দিনগুলোর ভেতর
যেখানে শীৎকার, মত্ততা আর বেলফুলে গাঁথা
জন্মরাত্রির উৎসবের আলো; দীর্ঘ দুপুর ভরে
অপেক্ষমাণ ঘোড়ার ভৌতিক পিঠের মত রাস্তাগুলো,
গলা পিচে তরল বুদ্বুদে ছলছল নক্ষত্ররাজি,
তার ওপর কোমল পায়ের ছাপ,—চলে গেছি
শব্দহীন ঠাকুর মার ঝুলির ভেতর।

দেয়ালে ছায়ার নাচ
সোনালি মাছের। ফিরে দাঁড়ালাম সেই
গাঢ়, লাল মেঝেয়, ভয়–পাওয়া রাত্রিগুলোয়
যেখানে অসতর্ক স্পর্শে গড়িয়ে পড়লো কাঁচের
সচ্ছল আধার, আর সহোদরার কান্নাকে চিরে
শূন্যে, কয়েকটা বর্ণের ঝলক
নিঃশব্দে ফিকে হল; আমি ফিরে দাঁড়ালাম সেই
মুহূর্তটির ওপর, সেই ঠাণ্ডা করুণ মরা মেঝেয় ॥

জানালা থেকে

নির্জ্ঞান যেন এক দীর্ঘ সমতল
যার দিগন্তে নেই কোন চূড়া —
আর আমি যেন সারাটা গ্রীষ্মকাল
তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলাম নিঃশব্দে, একা

যেখানে আঘাটার অপ্সরীবৃন্দ অপেক্ষায় স্পন্দিত হয়
গন্ধের হলদে পাতার বাগানে আর নেশা-পাওয়া হাওয়া
আসে যেন ভ্রমরেরও আগে
এবং বাউলের একতারার মত বেজে ওঠে চাঁদ,
অমাবস্যায় গোলাপঝাড়ের মত পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকি
ভরে রয় রাত্রির ময়দানগুলো জুড়ে;
এবং যুগল পিদিমের মত মা'র চোখের আশ্বাসের আলোয়
তরুণ ঘোড়ার পিঠে দ্রুত পেরিয়েছি শৈশব, কৈশোর।

কিন্তু দৃষ্টিহীন আকাশ ক্রমে নেমে এল
বিস্বাদে পীতাভ
এবং গেঁথে রইল জানালার মরচে-পড়া সারি সারি শিকে
যেন আমার মৃত অশ্বের ছাল টানিয়েছে কেউ
অকরুণ রোদ্দুরে।
আর আমি অপরিসর শয্যার চৌদিকে
অস্তিত্বের সীমা টেনে
দীর্ঘশ্বাসের কালোফুলে সাজাবো স্মৃতির বাসর।
নিঃসঙ্গতাকে যৌবনের পরম সুহৃৎ জেনে
তার সহোদরা কান্নার বাহুবন্ধে সঁপে দেবো
স্বপ্নের সত্য আর সত্তার সার
এবং আমার জানলা থেকে
নিরুপায় একজোড়া আহত পাখির মত চোখ
রাত্রিভর দেখবে শুধু

দূর দর-দালানের পারে
আবছা মাঠের পর নিঃশব্দে ছিন্ন ক'রে জোনাকির জাল
ছুটে গেল যেন এক ত্রস্ত ভীত ঘোড়ার কঙ্কাল !

পাশের কামরার প্রেমিক

গলা চিরে থুথু ফ্যালে দাপায় কপাট নড়বড়ে
শ্বাসকষ্টে যা পায় তা' প্রেম, ঠাণ্ডা হাওয়া
হৃৎপিণ্ডে বিরক্তিকর উৎকট নর্তন
অলৌকিক ইচ্ছা তার তাকে দিয়ে টেবিল বাজায়

মাঝরাতে নিঃসঙ্গতা রাঙিয়ে টেবিলে
একজোড়া লালচোখ, একটি লণ্ঠন
বিশ শতকের সুন্দর সুগোল এক পেটের ভেতরে যেন
দেখে নেয় প্রাক্তন প্রেমিকদের বিধ্বস্ত কবর

চোখের সামনে রাতভর নীলরজ্জু এক মুকুতা দোলায়
আর যেন তারার চুমকি-জ্বালা সেই অন্তর্বাস
যথার্থই সৎচেষ্টায় খুলে দিয়ে আকাশ দেখায়
খেলোয়াড়ের মতন একে-একে শূন্যতার সবগুলো ভাঁজ

তার সাম্‌নে সর্পের বঙ্কিম, শান্ত চতুরালি, স্পষ্টত নিষ্পাপ
ফোলা-গাল সাপুড়ের ভেঁপু একেবারে নির্ভয়, বিপদমুক্ত,
হস্তের অব্যর্থ ফাঁদে দেয় গলা বাড়িয়ে প্রেমিকা
ঝাঁপিতে আটকে রেখে বাতি-না-জ্বেলেই শোয়া যায়

এ হেন অনেক কিছু, একটু আয়াসে চীনেবাদামের খোসা
ভাঙতে-ভাঙতে পার হওয়া যায় হে দীপ্ত প্রেমিক, বন্ধু, ভাই
যথা শান্ত দুপুরে দেলাক্রোয়ার ক্রুদ্ধ, রুদ্ধ মত্ত অশ্বারোহী
ট্রেনে-কাটা শূকরের লালরক্ত, মৃত্যু, আর্তনাদ ।

কিছুই শোনে না কেউ তলপেটে অনাস্বাদিত বিহ্বল কাম
আত্মার ভেতরে ওড়ে নীলমাছি বিরক্তির, মগজে উদ্যান।
দীর্ঘজীবী হোক তবু যেন তার সব স্বপ্নক্রীড়া
মাঝরাতে যে কারণে হিমহস্ত টেবিল বাজায় ।

কবিতাই আরাধ্য জানি

কবিতাই আরাধ্য আমার, মানি; এবং বিব্রত
তার জন্য কিছু কম নই। উপরন্তু আছি পড়ে উপাধিবিহীন, জানি
বাণিজ্যে বসতি যার সেই মা' লক্ষ্মীর সংসারেই উন্মূল, উদ্বৃত্ত, তবু
কোনমতে টিকে-থাকা, যেন বেঢপ ভূমিকাশূন্য তানপুরা।

উপরন্তু গ্রাম্যজনে যেই গান চায় কিংবা গায়, ইদানীং ওহে
তা' কেউ জানে না আর, জানার উপায় নেই বলে?
কেননা যে আছে
হাত-পা ছড়িয়ে বেণুবনে, রুক্ষচুলে, শুক্‌নো মুখে
ফেলে সে দিয়েছে
আনমনে, সোনালি, নিটোল বাঁশিখানি, কোলের ওপরে হাত
ভারী হয়ে পড়ে আছে, মরা, একেবারে মরে-যাওয়া ম্লান খরগোশ।
কিন্তু সতেজ পাতার মতো তার কান, কর্ণকুহরে কুহক, ঘন্টাধ্বনি
দূর শহরের,
তাই আর খোঁজে না সে কাঁটাবনে, হৃৎপিণ্ডের ত্রস্ত-স্বপ্নে দ্রুত
কি করে ঝরে গেল, পড়ে গেল, নড়ে গেল হাত, হাতের বাঁশরী
—গেঁয়োমুখে নাবালক ভয় শুধু, উদ্বিগ্ন বিস্ময় আর এক
অসম্ভব দাবি,
বোঝে না সে জীর্ণ কাঁথার মতন পচে যায় গ্রাম্যগাথা সব
ম্লান শব্জীক্ষেতে।
ফেরার উপায় নেই; সহযাত্রীর হৃদয়ে নেই আর রাস্তার সংকেত,
পুরোনো লণ্ঠন
পিতামহের হা-খোলা, মৃত, হলুদ চোখের মত দ্যুতিহীন,
দেখায় না পথ।
ধ্বংসের বিপুল গুণে দেখা যায় মসজিদের বিদীর্ণ ধাপ
নেবে গেছে খাদে।

অলৌকিক অদ্ভুত দ্রব্যাদি সব খেয়ে-দেয়ে বাঁচি
সুহৃদের তিরস্কার বাতাসের সাথে সাথে এসে
লুটোয় টেবিলে, উল্টে দেয় সাধের গেলাস আর
নীল বাক্সো ম্যাচিসের ময়ূরের বর্ণালী পালক—

শব্দহীন ঝ'রে পড়ে দূর বাল্যকালে কেনা, ওই
লাবণ্যের নিঃসঙ্গ পুতুল আর সবুজ রঙের
টুপি থেকে; অগ্রজের তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায় বজ্র যেন
জানালায় যমদূতের মতন ত্রাস নেচে নেচে

কেবলই দেখিয়ে যায়, গহ্বর, কবর আর ম্লান
পাণ্ডুর রোগের রাত স্বপ্নহীন শীতার্ত শয্যায়;
প্রিয়তম মহিলার উদ্বিগ্ন, করুণ, রাগী স্বর,—
নাকে মুখে নম্র নখের আঁচড়, —বৃষ্টির ঝাপট,—

প্রতিবাদমুখর চিৎকারে যেন তারা নেভায় প্রদীপগুলো
স্বর্গের গোপন ধাপে-ধাপে আমি যা রেখেছি যত্নে,
একদা চয়ন ক'রে সভ্যতার মৃত অন্ত্র ছেনে,
কোনমতে শুঁকে-শুঁকে, ভয়ে, সরল জিহ্বায় চেখে

ইন্দ্রিয়সর্বস্ব, ক্ষুধামত্ত জন্তু যেন একরোখা।
দেখেছি প্রখ্যাত ক্ষেত, —নষ্টফল, —নক্ষত্রের মতো
ব্রাক্ষা, ইক্ষু, গম, সর্ষে আর জ্যোৎস্না আর ফাঁকা তাঁবু,
ঈশ্বরের উজ্জ্বল নীলিমা,—সন্ধিৎসু সন্তের মনে

সুন্দর সূর্যাস্ত থেকে ভোরবেলাকার সূর্যোদয়
পর্যন্ত হেঁটেছি। আর অসীম অধৈর্যভরে ঘেঁটে,
সেই চঞ্চল, পিচ্ছিল জরায়নে সভয়ে দেখেছি

শয়তানের ধবল মুখ : শূন্যতার বস্ত্রে মোড়া,

জরা, মৃত্যু, আর্তির চন্দন-ফোঁটা তার অবয়বে,
প্রশান্ত করেছে তাকে সন্ধ্যার মতোই আগাগোড়া,
আততায়ী, —লুকিয়ে রয়েছে প্রেমিকার অনুনয়ে,
অনুজের মূল্যবোধে, আমাদের উদ্বাস্তু দশকে

প্রগতির অন্বেষায় আর প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ
পিছুটানে, যত্রতত্র সমৃদ্ধির সকল খবরে,
সংবাদপত্রে ও মানুষের অন্তিম গন্তব্যে, আর
ক্রুদ্ধ সম্পাদকীয় মন্তব্যে ।
ফলত নিঃশব্দে নেমে পড়ি
কবিতার শুঁড়িখানাকে, মদ্যপের কণ্ঠনালী বেয়ে
মিশে যাই পাকস্থলীর, প্লীহার অম্ল রসায়নে ॥

শয়তানের ধবল মুখ : শূন্যতার বস্ত্রে মোড়া,

জরা, মৃত্যু, আর্তির চন্দন-ফোঁটা তার অবয়বে,
প্রশান্ত করেছে তাকে সন্ধ্যার মতোই আগাগোড়া,
আততায়ী, —লুকিয়ে রয়েছে প্রেমিকার অনুনয়ে,
অনুজের মূল্যবোধে, আমাদের উদ্বাস্তু দশকে

প্রগতির অন্বেষায় আর প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ
পিছুটানে, যত্রতত্র সমৃদ্ধির সকল খবরে,
সংবাদপত্রে ও মানুষের অন্তিম গন্তব্যে, আর
ক্রুদ্ধ সম্পাদকীয় মন্তব্যে ।
ফলত নিঃশব্দে নেমে পড়ি
কবিতার শুঁড়িখানাকে, মদ্যপের কণ্ঠনালী বেয়ে
মিশে যাই পাকস্থলীর, প্লীহার অম্ল রসায়নে ॥

অলীক

একটি নর্তকীর নাচ তার অন্তিমে
পৌঁছানোর আগে, দশ লক্ষ কথার ঝনৎকারে
বোঝা যায় আমি আর একা নই
এই সুন্দরতম শহরে ॥

পরস্পরের দিকে ॥

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছি
আমরা, এই অন্ধকারে।

প্যাঁচার তীব্র চিৎকার
যেন এই রাত্রির শরীরের ওপর,
নিরন্তর আঁচড় রেখে যাচ্ছে।

কোন সংগোপন উৎস থেকে বেরিয়ে আসছে
অনর্গল ছেঁড়া-খোঁড়া দৃশ্যগুলো :
একটা মদির অশ্ব বারবার লাফিয়ে উঠছে
বাতাসে শূন্যতায়,—
বাথানে ঝুলন্ত চাঁদ জবার মত লাল।

তোমার ক্লেদ সহসা ইন্দ্রধনু হল।
আর আমি কাঁকড়ার মত
অনুর্বর উল্লাসে ভোজে মত্ত, একের পর এক
শুধু ক্ষত তৈরি করলাম।

হঠাৎ ক্ষতগুলো
মাতালের প্রোজ্জ্বল চোখের মত,
মগ্ন, উৎসুক মুখ
আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল।

বাহুর বিন্যাসে নিবিড় হল সান্নিধ্য আমাদের।
শুধু এইসব দৃশ্যের অকারণ, অদ্ভুত
অনুভূতিগুলোকে ডুবিয়ে
তোমার কান্না আমাকে ছুঁতে পারল না।

সমকালীন জীবনদেবতার প্রতি

কবির নিঃসঙ্গতা নয়, প্রেমিকের নিঃসঙ্গতাও নয়,
কেননা গোলাপ কিংবা দয়িতার আসঙ্গে মরে না
জলোচ্ছ্বাসে নাচে না সে, বৃষ্টিতে ভেজে না, তবু যেন
আমারই কুটুম্ব কোন ভাবেসাবে পরম বান্ধব,
শূন্যতার অদ্ভুত আদল যেন দেখা-না-দেখায় মেশা
ঝুলে থাকে মাঝরাতে রেস্তোরাঁর কড়িকাঠ থেকে, —
বাদুড় না বেলুন বন্ধু, স্বপ্ন না হতাশায় ঠাসা ?

ভোজনরসিক যদি, নাও তবে জ্বলজ্বলে আত্মাটিরে আমার !
তোমারই ত' পরামর্শে আমি শুয়ে থাকি
যে বিছানায়, কবরের মত রুক্ষ আর ছোট তার প্রসার—

তবে কি দশ লক্ষ কৃমি তুমি ? ধূর্ত কোন শেয়াল ?
যখন থাকে না গাঁ-এর লোক, ঝোপের আড়ালে তুমি, তুমি-ই
ভবিষ্যৎ আমার দুটো লাল চোখ মেলে ওঁৎ পেতে থাকো,
হারে বিধি ! যেমন কর্ম তার তেমনি নষ্ট ফল !

গীতে-বাদ্যে, ধ্বনিতে ওহে, তুমি নিলে যত উপচার
মহিলারা নেয় নি তত, কিন্তু তারা চেয়েছিল সহজ উদার
দুই হাতে তুলে দিতে সফেদ দুধের জামবাটি ।

কিন্তু আজ অন্ত্রনালীতে ঘা, নির্ঘুম রাত্রিতে আমার,—
এই ত' সখ্যতা তোমার দিগন্তে গেঁথে দিল শুধু
নির্বীজ কান্নার মত একফোঁটা চাঁদ, অনুধ্যানে যার
জোটে না মাধুরীকণা মনে হয় নিঃশেষিত সকল গেলাস !

আমি ত' চাই নি কখনও পাঁচ শ' সুন্দরী কিংবা হারেম,
ক্রীতদাস ক্রীতদাসী মনোরম রাজ্যপাট, গোপন বাগান

প্রোজ্জ্বল গালিচা আর মুক্তাখচিত কোন মখমল লেবাস
নেকাব সরিয়ে কোন ইহুদি রমণীর মুখ, দামী আসবাব

বরং কুঞ্চিত ভ্রূ, বিরক্তি আর উৎকণ্ঠায় ভরা,
ভেবেছি তুমিই আমার পরম রমণীয় ঝাড়বাতি
রাশি রাশি সোনার মোহর ভর্তি রূপালি এক ঘড়া,
দেখা দেবে মাঝরাতে মন্ত্রে-তন্ত্রে ভরা চন্দ্রের মতন
অথবা বাড়াবে মুখ, উৎসুক জানালা বেয়ে সলাজ উদ্ভিদ ।

একদা তুমিই ছিলে পৌষের প্রখর রাত্রে, ঝিল্লীর মুখরে
নর্মসহচরী, সুন্দরী, নিদ্রাহীন নন্দনের লীলাসঙ্গিনী,
আঁধারে ঘোমটার তলে কৌতুকে স্মিত-মুখ জীবন দেবতা,
ছিল না দন্তে ধার, ময়লা নখ, তামাটে দীর্ঘচুলে জটা
পেভমেন্টে ঠাণ্ডারাতে দংশনে আক্রান্ত কোন যুবকের মত
স্বপ্নের নির্মোকে পুরে দাও নি বন্ধু, হঠাৎ আর্তনাদ ।

নগ্ন

বারান্দার ত্রিভুজ কোণে
খোলা জানালার সারি সারি শিকের ফাঁক থেকে
দেয়ালের ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে
হতাশার একটি রন্ধ্র দিয়ে
সন্তের নিঃসঙ্গতায় দাঁড়িয়ে
নিষ্কাম ভীড়ের বিস্ময়ে
মরণের টানেল থেকে
ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়
দেখি স্নানরত
একটি নারী,
নগ্ন।

দুই প্রেক্ষিত

(তাহের, সুকুমার ও আরিফকে)

ঈর্ষা আর আকাঙ্ক্ষাগুলো,
কেমন সুন্দর থরে থরে, শহরে
প্রতি ভাঁজে জড়ানো বিজ্ঞাপনে
ছোট ছোট খেলনার মত বাড়িঘরদোরজান্‌লার
রঙে, জোড়ায় জোড়ায় আলিঙ্গনে,
নীল হলুদ ফুর্তিবাজ পাখিদের আনন্দগুলো
তরুণ–তরুণীর চোখে, উৎসবে, বর্ণালী বাল্‌বে
ত্রিলোকের অন্ধকারে সকল আঙুর ক্ষেতে
একটি উজ্জ্বল বড় মুদ্রা জ্যোতিচক্রের মত ঘিরেছে জীবনকে;

কিন্তু আরো বড়ো প্রেক্ষিতের আঁধারে বাতি জ্বলে :
গোপনচারী ক'একটি অজ্ঞাত হৃদয়,—আয়ুর অনলে॥

মোহন ক্ষুধা

(মুশার্‌রফ রসুলকে)

উনুনের লাল আঁচে গাঁথা-শিকে জ্বলছে কাবাব,
শীতরাতে কী বিপজ্জনক ডাক দ্যায় আহ্লাদে শহর,
কালো রাস্তার বেঞ্চিতে চলো যাই পঙ্‌ক্তিভোজনে, ক্ষান্ত তবে
হবে কি প্রেতার্ত ক্ষুধা? লকলকে আগুনের মত নাচে,
জিহ্বা নাচে ! কত খররৌদ্র এই অন্ত্রের জটিল পাকে-পাকে,
নরমুণ্ডের মত জ্বলন্ত সূর্য গলার ভেতর থেকে নেমে গ্যাছে,
রোমে-রোমে হর্ষ লাগে, গ'লে পড়ে বিষাদ সঙ্গীত
নিন্দুকের,—কেবল আত্মা যার বিবাদ আর বচসায় ভরা,
সে জানে কী মধুর ক্ষুধার্ত যুবাদের নব্য জয়ধ্বনি !

নাসারন্ধ্র পরিশ্রমী অশ্বের মতন ফোঁপায়, মুখ থেকে
নামে কষ জীবনের সমান সতৃষ্ণ, শান্তিহীন সহিষ্ণুতায় :
রগ টেনেটেনে কেউ শক্ত হাতে বুঝিবা বাজাবে,
ঝিম্ ধরে মাথার ভেতর; ভালবাসার আরক্ত মাকড়
জাল রাখে, খুব আস্তে এই সর্বেসর্বা মাংসে, রক্তোচ্ছ্বাসে।
দারুণ বিস্ফোরণ এনে দিল ক্ষুধা; সম্ভাবনার হিরণ্ময় মেঝেয়
এই ক্ষণে ছিন্ন ঘাঘ্‌রার দ্যুতি, উরুর অরুণিমা, দুরন্ত পা
চক্ষে মাধুরী জোগায়, ভরে দ্যায় অশান্ত নিষ্ঠুর জাগরণে॥

বিপরীত বিহার

বলিহারি যাই তোর অদ্ভুত বররুচি
ভিখিরিও ছোঁবে না যা নোংরা আঙুলে
তাই শেষে তুলে নিলি অমন সুন্দর চঞ্চুপুটে

চঞ্চল স্বভাব তোর, কিন্তু তবু কানা করল কে ?
ক্ষুধা ? আমি তো রেখেছি যত্নে, উষ্ণ নরম শাদা রুটি
পচা মাংসেই ঘটালি তো রসনার অশুচি !

আমি কি দেখাই নি সূর্যাস্তে নীলিমার রঙীন উদ্যান
আত্মম্ভরিতায় তবু চোখ রাখলি আঁস্তাকুড়ে,
ছেঁড়াখোঁড়া, ত্যক্ত, বিরক্ত বেসামাল বীজাণুর উৎসবে

সান্ধ্যভ্রমণ ভালো, হাওয়া খোলামেলা,
অস্থির চরণ তোর নিয়ে গেলো কাফের গুমোটে
যেখানে জটলা পাকায় সমবয়সী বেকার হা-ঘরে বাউণ্ডুলে

সৎসঙ্গ লাগে নি ভালো ? সজ্জনের কথা ?
কৃমিও যায় না যেই দুর্গন্ধের নর্দমায়, পাকে
সেখানে ভাসালি বুক ? যেন আমি রাখি নি পেতে ফেননিভ দুগ্ধশয্যা,

শীতরাতে একটি গরম শাল, নীলরঙা জামা ?
কিছুই ধরে না মনে বুজরুকিভরা হে ঐন্দ্রজালিক শাস্ত্রের পণ্ডিত,
নগ্নগাত্রে নেচে নেচে অবশেষে নিবি কি সন্ন্যাস!

দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে উৎসবের ঋতুতে
কোন ভূতে পেল তোরে ? যখনই চেয়েছি কোন গান
ত্রিকাল বধির করে অশুভ জ্যোতিষী যেন, উদ্‌ভ্রান্ত গণক
ছুঁড়ে দিলি কেবল চীৎকার ।

নিসর্গের নুন

(রফিক আজাদকে)

আমিও সশব্দে নিসর্গের কড়া নেড়ে দেখেছিলাম
পুকুর পাড়ের ঝোপে চুপিচুপি
ডাকাত-পড়ার ভয়ে স্পন্দমান নিঃশ্বসিত জল
কুলুপ লাগালো তার নড়বড়ে নষ্ট জানালায়

কাঠবেড়ালও নই যে কর্মঠ গতিতে তরতর উঠে যাবো
যে-কোন গাছের দোতালায় কিম্বা
ডোরা-কাটা ভারী সাপের মতন প্রাকৃতিক আহার ফুরালে
আচমনহীন পালাবো গর্তের ঠাণ্ডা কামরাতে
রাত্রির আঁধারে ইন্দ্রনীল চোখ দুটো জ্বেলে কণ্ঠের গর্জনে
সুপক্ব ফলের মতো খসে পড়বে সন্ত্রস্ত বানর !

কেক্-পেস্ট্রির মতোন সাজানো থরে থরে নয়নাভিরাম
পুষ্পগুচ্ছের কাছেও গিয়েছি ত', ম্লান রেস্তোরাঁর
বিবর্ণ কেবিনে আশ্রয়ের যে আশ্বাস এখনও
টেবিল ও চেয়ারের হিম-শূন্যতায় লেখা আছে
তেমন সাইনবোর্ড কোন জুঁই, চামেলী অথবা
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপে-ঝাড়ে আমি ত' খুঁজেও পেলাম না।

পাখির ছানার মতো দ্রুত সপ্রাণ লাফিয়ে ওঠা
পলায়নপর একটি অপটু
গোলাপের কম্প্র গ্রীবা ধরে আমিও চিৎকার করে
বোল্লাম : যা দেখছো শুধু ছদ্মবেশ এ আমার
এই জামা, এই ট্রাউজার,

এই জুতো আর
ময়লা হলুদ, এই আণ্ডারওয়ার
তোমরাই চিত্তশুদ্ধি নাকি হে দয়ার্দ্র ঘাস, গোলাপ, আঁধার !

ইতিহাসের তমসায় সশঙ্কিত শামসুর রাহমান
দাঁড়িয়ে আছেন চন্দ্রাঙ্কিত মুখে
আর মুহ্যমান আল মাহমুদ চট্টগ্রামে টিলার ওপর
বুকে পুরে ঝোড়ো আবহাওয়া
বেঁচে আছে তোমারই অশেষ কৃপায়
বাঙলা দেশে তুমি নাকি কখনও কাউকে
করো নি বিমুখ ?

আমাকেই দেখে তুমি
ঘোম্‌টা তবু তুলে দিলে বধূ ? তোমার খ্যাম্‌টা নাচ
কে দ্যাখে নি ? আজীবন নন্দিত রবীন্দ্রনাথ থেকে
শুরু করে তিরিশ ও তিরিশোত্তরের অনেকেই,
এমনকি কোন-কোন অনুজ পর্যন্ত ! আর তোমার নিবিড়
নীলাকাশ, তার নীচে ভাঁটফুলের ঘুঙুর শুনে
একদা জীবনানন্দ দাশ বসবাসযোগ্য ভেবে
আমরণ থেকেই গেলেন বাঙলা-দেশে শহরতলীর কোন
স্বপ্ন-পাওয়া ময়লা-ধোঁয়াশা-ঢাকা বৃক্ষের মতন ।

ন্যুইয়র্কে নির্বাসনে যদিও অমিয় চক্রবর্তী তবুও তো' পেয়েছেন
কবিতার উজ্জ্বল অমল ডালাপালা
আর ক্ষিপ্ত মিসিসিপি'র গাজনে যমুনার উচ্ছল ভজন,
ভল্‌গা-গঙ্গার ধারে ধারে
হে নিসর্গ, হে প্রকৃতি, হে সুচিত্রা মিত্র
হে লঙ-প্লেয়িং রেকর্ডের গান
হে বিব্রত বুড়ো-আংলা, তুমি গীত-বিতান আমার ।

ইচ্ছে ছিলো কেবল তোমার নুন খেয়ে আজীবন
গুণ গেয়ে যাবো
অথচ কদ্দিন পরে বারান্দা পেরিয়ে
দাঁড়িয়েছি ঝোপে
ধারালো বটির মতো কোপ মেরে
কেন যে, কেন যে
দ্বিখণ্ডিত করছে না
এখনও সুতীক্ষ্ণ বাঁকা
ঐ বঙ্গদেশীয় চাঁদ ।

ইন্দ্রজাল

রাত্রে চাঁদ এলে
লোকগুলো বদলে যায়
দেয়ালে অদ্ভুত আকৃতির ছায়া পড়ে
যেন সারি সারি মুখোশ দুল্‌ছে কোন
অদৃশ্য সুতো থেকে
আর হাওয়া ওঠে
ধাতুময় শহরের কোন্ সংগোপন ফাটল
কিংবা হা-খোলা তামাটে মুখ থেকে
হাওয়া ওঠে, হাওয়া ওঠে
সমস্ত শহরময় মিনার চুড়োয় হাওয়া ওঠে

(ওড়ে কত শুকনো কাগজের মত স্বগতোক্তি
খড়কুটোর মত ছোট ছোট স্বর, নৈরাশ্যের কালো ফুল)

কেউ ঢোকে পার্কে, ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা
নেমে যায় পিচ্ছিল কৃমির মত
স্বপ্নের সুড়ঙ্গপথে
সহজ, অবাধ; ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে
ইচ্ছার মদির চাপে যেন শুঁড়ির রুক্ষ হাতে
টলটলে দ্রাক্ষার মত
ঠোঁট ফাটে।

তখন মুঞ্জরিত মাংসের ঘরে
পাঁচটি প্রদীপ আনে আলোকিত উৎসবের রাত
(ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে)

তখন ইন্দ্রিয়ের সবুজ ঝোপে
পাঁচটি লাল ফুল আনে সৌরভের রাত

(ঠোঁট ফাটে, ঠোঁট ফাটে)

তখন মোটরের অপরিসর ফিকে আঁধারে
চিনতে কষ্ট হয় সঙ্গিনীর অঙ্গরেখা
উরুর গঠন আর সফেদ দন্তরাজি;
দেয়ালে জানালার কাঁচে নিরন্তর ছায়া নড়ে
লোকগুলো বদলে যায়, বদলে যায়, বদলে যায়
রাত্রে চাঁদ এলে॥

ভরা বর্ষায় : একজন লোক

লম্বা লম্বা সরু বৃষ্টির আঙুল লোকটাকে হাতড়ে দেখেছে
তার জ্বলজ্বলে জামা শপশপে ভেজা।
দুর্মুখ, নীচু মেঘার্দ্র আকাশ, চারিদিকে তাকালো সে
তামাটে মুখে বিরক্তি আর বয়সের রেখা

সম্ভবত তিন দিনের বৃষ্টি
তার স্বপ্নের দেয়ালে হলদে স্যাঁৎসেতে চিত্র রেখেছে
এবং বিছানার ঠাণ্ডা, মৃত নিরুত্তর চাদরের ভাঁজ থেকে
লাফিয়ে উঠেছে রাগী ফণার মত কারো অনুপস্থিতি
কিংবা স্মৃতি কিংবা নিঃসঙ্গতা,—
যা কিনা বাসি, নরম খবরের কাগজের নীচে ঢাকা পড়ে না

কনিয়াকের করুণ লেবেলহীন শূন্য বোতল
সামনের টেবিলে রাখা, বাঁ-হাতে শস্তা, কড়া সিগ্‌রেট,
লোকটা ফতুর হয়ে বসে আছে, চুপচাপ, একা
যেন কোন ভয়ংকর কয়েদখানার সতর্ক প্রহরী

হয়ত কেউ ছিল
তার পরম, উষ্ণ সন্নিধানে
জল যেমন করে উপকূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে

লোকটা আরেকটু সরে বসলো জানালার কাছে,
আর তার মার্বেলের মত ঠাণ্ডা নিরেট চোখে
ঔৎসুক্য
একজোড়া রাঙা মাছের মত হঠাৎ নড়ে উঠলো :
দূর একটি ম্যানসনে, গাড়ি বারান্দায়
হল্লামুখর জনতার অংশ গল্পগুজবে ভরা
এই রাত্রিতে, যখন আকাশ মেঘার্দ্র, দুর্মুখ আর নীচু,

উৎসবের নাগরদোলায় অন্তহীন মানুষের ওঠা-নামা,
যদিও পরনে সবার
শাদা-শাদা নিষ্করুণ বিষণ্ন, ঠাণ্ডা, মরা জামা।

আলোকিত গণিকাবৃন্দ

শহরের ভেতরে কোথাও হে রুগ্ন গোলাপদল,
শীতল, কালো, ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা,
অস্পৃশ্য বাগানের ভাঙাচোরা অনিদ্র চোখের অপ্সরা,
দিকভ্রান্তের ঝলক তোমরা, নিশীথসূর্য আমার।
যখন রুদ্ধ হয় সব রাস্তা, রেস্তোরাঁ, সুহৃদের দ্বার,
দিগন্ত রাঙিয়ে ওড়ে একমাত্র কেতন,—তোমাদেরই উন্মুক্ত অন্তর্বাস,
—অদ্ভুত আহ্বান যেন অস্থির অলৌকিক আজান।

সেই স্যাঁত্‌সেতে ঠাণ্ডা উপাসনালয়ে পেতে দাও
জায়নামায, শুকনো কাঁথা, খাট, স্তূপ স্তূপ রেশমের স্বাদ।
আলিঙ্গনে, চুম্বনে ফেরাও শৈশবের অষ্ট আহ্লাদ!
বিকলাঙ্গ, পঙ্গু যারা, নষ্টভাগ্য পিতৃমাতৃহীন,—
কাদায়, জলে, ঝড়ে নড়ে কেবল একসার অসুস্থ স্পন্দন
তাদের শুশ্রূষা তোমরা, তোমাদের মুমূর্ষু স্তন।

ক্ষণকাল সে নকল স্বর্গলোকের আমি নতজানু রাজা
কানাকড়ির মূল্যে যা দিলে জীবনের ত্রিকূলে তা নেই
অচির মুহূর্তের ঘরে তোমরাই তো উজ্জ্বল ঘরনী
ভ্রাম্যমাণেরে ফিরিয়ে দিলে ঘরের আঘ্রাণ,
তোমাদের স্তব বৈ সকল মূল্যবোধ যেন ম্লান!

অবিচ্ছিন্ন উৎস

প্রথমে ছিল কণ্ঠস্বরে, ভাষার দ্যোতনায়,
একটি স্তব্ধতা থেকে অপর স্তব্ধতায়, তারপর
উঠে এল তার বন্য বিপর্যস্ত চুলের ছোঁয়ায়

যেন স্রোতস্বিনী নদী বয়ে গেল আমার বিহ্বলতার ওপর
যেন সোনালি বালির তীরে দুটো নক্ষত্র নিয়ে ঠেকে গেল
নৌকো একজোড়া।

চুলের প্রান্ত থেকে দুলে উঠলো চোখের মণিতে
যার আলোয় জন্ম নিল কবিতার আভাস-লাগা
কয়েকটা নক্ষত্রপঙ্‌ক্তি,—প্রথমে যা ছিল কণ্ঠস্বরে ভাষার দ্যোতনায়॥

পতন

সব কিছু নষ্ট হয় অবশেষে দ্রুত অধঃপাতে
প্রথম রক্তিম কুঁড়ি লোলচর্ম প্রাচীন ফলের ম্লান ছাঁচে
নিঃশব্দ পচনে যায় নীলরঙা মাছিদের উল্লোল উৎসবে

টেবিলের উজ্জ্বল রেডিয়ো —একদিন জ্বলে না ডায়াল তার
নিরালোকে পড়ে থাকে নিঃসঙ্গ ধুলোর আস্তরণে বহুদিন
একে একে খসে পড়ে প্রতি অঙ্গ, ঝলসে যায় তালুভ

চিকন মসৃণ তার, প্রাণবাহী শিরা উপশিরা,
ছিন্ন হয় টেরিলিন, মহিলার ত্বকের মহিমা,
গ্যারেজে বিধ্বস্ত হয় মোটরের মাংসল টায়ার,

নরম পাৎলুন আর চকচকে চালাকির মত সব চোখামুখো জুতো,
পরিত্যক্ত একা ট্রেন রৌদ্রঝড়ে, বুড়ো মুখ পোড়ো জানালায়
প্রাচীন আর্শির মত পারা-ওঠা, সবকিছু আতঙ্ক রটায়।

চন্দ্রালোকে

কি শস্তায় পরিষ্কার হল ঊর্ণাজাল,
হলুদ কাগজ, কাঁটাতার ময়লা পুরোনো দাগ,
দেয়ালের বালি; বিশল্যকরণী দিয়ে ছুঁলো চাঁদ
সন্ধ্যায়,—বিশীর্ণ ম্লান লম্বা জ্যোতিপাতে
অতর্কিতে একটি বাড়ির বাঁকে, ঠাণ্ডা ফুটপাতে।
অচেনা গলার ভাঙ্গা ভারী গান অদৃশ্য গলিতে,—
বিধ্বস্ত, স্মৃতির মত পাঠালো সে ঝলকে ঝলকে পলক-না-পড়া হাওয়া
ফিরলো উষ্ণতা যেন পুরোনো কোমল মখমলে; বাতি-জ্বালা, লাল, নীল
কাঁচের দোকান একপাল অপ্সরীর মত নেচে নেচে
দেখালে কত-না রঙ্গ, যেন তারা কত মোহনীয়,
একরাশ ধুলোপাতা বিশুদ্ধ আনন্দে শুধু তাল ঠুকে গেল।

পরাস্ত সকল ইচ্ছা, উদয়াস্ত যা-যা ভেবে মরি
তার কোন সুন্দর সচল সমাধান করে দিতে পারবে না এই হাওয়া
শুধু এক নির্বোধ, পরম বালখিল্যতায় জড়িয়ে ধরতে চায় গলা।
ফিরে ফিরে ভাঙ্গা হারমোনিয়াম আনে অতীত আর্দ্রতা
'হে আমার প্রেম, নিষ্প্রাণ ময়ূরপঙ্খী কোন জলে ভাসবে না ?'
(বালির তরঙ্গে তার নিতম্বের কঠিন করোটি, কোন কান্নাই ছোঁবে না)
হে আমার প্রেম, নিষ্প্রাণ ময়ূরপঙ্খী দাঁড় পড়ে হৃৎস্পন্দনে
আমার অপেক্ষা ফুরোবে না।

এই শীতে

শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না যেন
বেঁচে থাকা ছাড়া, বসন্তের শিথিল স্তন
নিঃশেষে পান করে নিঃস্বার্থ মাটি
লতা-গুল্ম গাছ কাক শালিক চড়ুই
এমনকি অসহায় গর্তের দেয়ালের জীব.....

সে উদ্বৃত্তের দিনে বিপ্রলাপী স্বভাবে যার
আসক্তি আসবে, সেতো মৃত্যুগামী, ডোবেই
এমনকি অগ্রজও টলে, অচিরে হারায়
মনের সমতা সেই ঘনতা : প্রজ্ঞা যার নাম।
কেননা বসন্ত শুধু কবির হৃদয়ে নয়,
কারো-কারো মগজেও নামে;
এবং
তারাও হন্যে হয়, অন্ধকার আশ্লেষে কাঁপে।

অথচ এ-শীতে একা, উদ্ধত আমি,
আমি শুধু পোহাই না ম্লান রোদ
প্রতিবেশী পুরুষ নারী আর বিশাল
যে রিক্তগাছ, সে ঈর্ষায় সুখী
নিয়ত উত্তাপ দিই বন্ধু পরিজনে।
আমি শুধু
একাকী সবার জরার মুখোমুখি।

এবং আরো একজনের চোখে দেখি
লক্ষ সূর্যের আসা-যাওয়া এবং সেও একা
আমারই আত্মার মত
প্রাঙ্গণের তরুণ কুকুর।

নির্বাণ

রাস্তার ধারে সে ফুলছে, বাচাল বসন্তের অধিরাজ,
পিচ্ছিল পোকাগুলো তার হা-করা চোখের
চুইয়ে পড়া রসে ঘুরছে, কী মসৃণ।

ঢের অলি-গলি মাড়িয়ে সে আপন
একাধিপত্যে মাননীয় ছিল সব গৃহস্থের ঘরে।
গুণীর মত তার গলার সামান্য কসরৎ
সহজে লাগাতো তাক : মৃদু একটু গর্‌র্‌
ত্রস্ত সবাই তারে পথ ছেড়ে দিতো,
এবং সে বিজয়ী রাজার মত পায়ের অরণ্য ঠেলে
বেরিয়ে আসতো এই বড় রাস্তার ধারে।

বড় রাস্তা,—যেখানে নশ্বর সব মেলায়-মেলায়
চকিত উদ্ভাসে হল্লা-জেল্লা, মুখ, যান—
তাকে সে এড়িয়ে চলেছে চিরকাল; কেননা সেখানে তার
অস্তিত্ব শুধু একরাশ অস্বস্তির স্তূপ !

কখনও সে বৃত্ত ছেড়ে যায় নি কোথাও
এবং অলৌকিক বাসনায় ঘুরেছে চরকির মত
নিজেরই বঙ্কিম, ঋজু লেজের পেছনে।
এমনকি মাঝে-মাঝে এক একটা সুডৌল দিন
ঘুরতে ঘুরতে কেটেছে কী দুরাশায়,
নিজেকে করেছে সে ধাওয়া।

কিন্তু সে আশ্চর্য ফুর্তিবাজও ছিল,
রঙিন বলের সঙ্গে তার উল্লাস
আনন্দে ভরে তুলতো সারা পাড়া
এবং তার উদ্ধত গলা-ফোলা গর্বের ভারে

আমরা সব নোয়াতাম মাথা।

সারাটা বসন্তকাল সে জ্বলতো শিখার মত,
আর ফুল না ফুটলেও অন্তত তার লালা
চরাচর সিক্ত ক'রে তীব্র কামনার মদে
ডুবিয়ে দিয়েছে সব; সে বিশাল আঁধারে
একান্ত নির্ভর ছিল মাতাল আশ্লেষ :
দৃশ্যমান অনন্য পাল ।

এখন সে নির্মোহ, পড়ে আছে একধারে, চুপ।
ফুলে গেছে জল-ভরা মশকের মতো :
মন্মথ সুহৃৎ তারে সুড়সুড়ি দিলেও
তেমনি সে পড়ে থাকে একলা, উদাস
সীমার বাইরে অধিরাজ ।

এবং চোখের মণিতে তার পড়েছে ধরা
নির্বিকার চিরন্তন,—থেমে আছে অপরূপ
বিশাল, বাসন্তী আকাশ সন্ধ্যার,—
গভীর ধ্যানীর মত মোহন, তন্ময় !

শত্রুর সাথে একা

হারিয়েছে সে যে পাখির বৃত্তি
কাজের নরকে প্রাণ,
শত্রু যে তার শত্রুর সাথে মিতালি ।

পায়নিতো খুঁজে মিত্রতা কারও
প্রাণের শ্রমের ক্লান্তির শেষে শুয়ে,
অথবা ব্যর্থ কালির আঁচড়ে কেঁদে
বিবর্ণ ভোরে মাথা কুটে তার দোরে
ফিরেছে আবার নরকের টানে
অমোঘ প্রহরে একা,
শত্রু যে তার শত্রুর সাথে মিতালি !

সে জানে আপন জানা-অজানার ত্রিলোকে,
যারা অগণ্য পৌষ বুকে পুরে বাঁচে,
বেড়ার আড়ালে অলক্ষ্যে ইশারায়
ভবিতব্যের ভাগ্য-তারাও ঘোরায়
স্বাধীন প্রাণের বৃত্তে আবার ছড়ায়
বর্বর হাত জরা
শত্রু যে তার শত্রুর সাথে মিতালি !

কতকাল আর বিরূপ দুখের পাড়ায়
অসম্ভবের পর্দা সরিয়ে প্রাণের
উত্তাপে তাকে পাবার নিবিড় আশায়
ক্ষয় করে তার দুর্লভ ক্ষণ গানের
প্রসন্ন মনে হারানো মেঘের খোঁজে
হেলায় হারায় কাল,
শত্রু যে তার শত্রুর সাথে মিতালি ।

কবি-কিশোর

তুই শুধু বেঁচে গেলি বিভীষণ অন্যদের ছুঁলো
নীলিমার উষ্ণ জরায়নে তিলে-তিলে জমে-ওঠা
লালাভ স্পন্দন
দ্যাখে নি কোথাও কেউ, কোন লোক, কোন বোকা চোখ
বিশ শতকের শূন্য নিঃস্বপ্ন আকাশে জ্যোৎস্না-লাগা
মেঘের ঝুলনা,—
অলীক, অদ্ভুত, হাস্যকর : এইমতো ঠাওরালো
সকলেই, সকলেই—
তুই শুধু বেঁচে গেলি বিভীষণ অন্যদের ছুঁলো !

চারদিক কালো-মাথা তবু গোধূলিতে কী সুন্দর
ওই সিন্ধুজল
কেঁপে ওঠে, তরঙ্গ ছড়ায় পরীদের গন্ধবাহী
মন্থর হাওয়ায়
ক্ষীণায়ু মোমের মতো ম্লান সূর্য-প্রয়াণের পর
ককায় অপেক্ষমাণ পড়ে-থাকা স্তব্ধ পটভূমি
স্বপ্নের উজ্জ্বল দাগে আকাঙ্ক্ষার কঠিন আঁচড়ে
ভরে গেলো,
তুই শুধু বেঁচে গেলি, বিভীষণ অন্যদের ছুঁলো ॥

জন্মবৃত্তান্ত

সূর্যের জ্বলজ্বলে আরক পান করেছিল নাকি
মাতৃজরায়ন, আমার মাংসে যার
বিচ্ছুরিত তাপ ! হরিদ্রাভ আকাশের ওষ্ঠে জমে ওঠা
আমি কি হঠাৎ কোন পথভ্রষ্ট চুন ?

দৈবাৎ বিক্ষিপ্ত এই বিশ্বলোকে
মুহ্যমান নগরশীর্ষে
লুটিয়ে পড়া এক নির্বাসিত কেতন
অথবা শূন্যতার সৌরগলার নক্ষত্রোচ্ছল বমন ?

তবে কি আপাতরম্য স্বতন্ত্র
রসায়নে তারতম্য দেখা দিলে
গাছ-পালা রৌদ্র-জলের সঙ্গে
বৃষ্টি আর কাদায় কুঁকড়ে
আগুনের আশ্লেষে
হঠাৎ হাওয়ার শিউরানি

ভরে দিলো, ছুঁড়ে দিলো যেন মন্দের পরামর্শে
এই মৌলিক দূরত্বে ?
(অর্থাৎ নিকষ বিচ্ছেদ)
ঝোপের আড়ালে থাকে শেয়ালেরা
গাছের শিখরে নীলকান্ত মণির মত চোখে
চেয়ে দ্যাখে পাখি, হাতের উৎসর্গিত রুটি,
অঞ্জলির জলে বসায় না মুখ কোন
চিতল হরিণী কিংবা চিত্রার্পিত চিতা
দূর থেকে ডাকে কাঠঠোকরা
দুলকি চালে কাঠবিড়ালী যায়,—

নিঃশব্দে রুটি ঝরে, জলে ভাসে কেবল
নিজস্ব মুখের আদল ॥

নর্তকী

'How can I know the dancer from the dance'

—W. B. Yeats

যেন নীলাভ শিখার মত নির্ভার
চপল ডানায় হাওয়া-লাগা দিগন্তলীন কোন পাখি
শূন্যতা গেঁথে নেয় নানান বিন্যাসে
শিল্পিত জীবন বাজে সংঘাতে সংঘাতে
অর্থহীনতার পরপারে, দুইটি নৈর্ব্যক্তিক নূপুরে

সব স্মৃতি-বিস্মৃতি, নৈঃসঙ্গ-নির্বেদ
ছন্দিত ঘূর্ণির রেখায় নিথর ঘাঘরার মত
যুগপৎ নৃত্যরত এবং সুস্থির,
প্রত্যেক চরণাঘাতে মুহূর্ত জ্বলে ওঠে গোলাপপুঞ্জের মত,
যার মারাত্মক দ্যুতি পান করে নিঃসঙ্গ আত্মা লোটায়
অস্তিত্বের অন্তহীনতায়
যেখানে গলে-যাওয়া ব্যাঙের শব মরাল-পঙ্‌ক্তির মত ওড়ে
আর মাংস গুঞ্জরিত হয় নীলিমার আশ্লেষে

যেন সমুদ্রোচ্ছ্বাস তার বাহুতে, কটিতে
জঁঘার আলোড়নে, নিতম্বের তৃষ্ণার্ত তরঙ্গে
তরোয়ালের মত কিংবা তীক্ষ্ণ ধারালো চাঁদের মত
চোখের আঁধারে ঐ স্বর্গের ডাইনী যেন গতির পুলকে
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায় ॥

আমন্ত্রণ : বন্ধুদের প্রতি

(জাহাঙ্গীর, বাচ্চু, নীরু, ও টুটুকে)

মাঝরাতে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে, স্পন্দমান
প্রাক পুরাণিক ঋণ শোধের উৎসবে,
এসো পরস্পরের রক্তিম লোনা মাংসে
হৃৎপিণ্ডের দামামায় আজ মুছে দিয়ে প্রস্তাবনা
সভ্যতার, গোধূলির রঙে দন্তরাজিরে রাঙাই

তবেই তোমার সাথে চেনাশোনা রক্তলাল চোখে
পৌঁছোবে প্রার্থিত পূর্ণতায় ।
তুমি এসো,
আমি নির্ধারিত অঞ্চলেই বন্ধু, তোমার তন্ময় প্রতীক্ষায়
দাঁড়িয়ে থাকবো ঠায়, বর্ণোজ্জ্বল চোখে মোরগের
উষ্ণ অহঙ্কারে,
কিংবা উঁচু ডালের অদৃশ্যে, গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুরলতার স্বপ্নে
নির্বোধ কবির মনে নেশাগ্রস্ত আত্মনেপদীর
রীতিতে বিভোর,
কেন না যদিও ধূর্ত আমি শেয়ালের মতো
গৃহস্থের করুণায় কোনমতে বাঁচি
আর অচিকিৎস্য উজবুকের মতো
হতাশার প্রসারিত উঠোন পেরিয়ে
অতল সংকীর্ণ কোন নীল স্বপ্নকূপে ডুবে মরি,

অতএব অনায়াসে ধরাশায়ী হতে পারি আমি ।

দয়ার্দ্র কানন

এ যাত্রা ত' বেঁচে গেছি, কিন্তু বারবার
ক্ষমা সে করবে না হে তেমন দয়ার্দ্র নয় সে কানন
যে-কোন অশুভ লগ্নে নাচাবে ময়ূর-নাচ, জেনো
এমন কিছুই অনাক্রমণীয় নয় এই ইন্দ্রিয় পঞ্চম,
বরং অনতিক্রম্য তার পৌরাণিক পরিভাষা
দারুণ লাবণ্যময়, রমণীয় গুণে একাকার
যত-না দেয় সে শান্তি তার চেয়ে বেশি হাহাকার
আন্ধার মান্দারগুচ্ছে, নিষ্পলক গোলাপে-গোলাপে
বৃক্ষচূড়ে, লতাগুল্মে, বাতাসের গোপন মর্মরে
—তার কোন দায়ভাগ আমাতে না বর্তে কি এমনিই
ছেড়ে দেবে ? জানি, তেমন দয়ার্দ্র নয় সে কানন
যে-কোন অশুভ লগ্নে ঠিক জেনো জানাবে দংশন
তেমন কিছুই নয় আমার অস্তিত্ব ওহে সুদর, গোপন
এবং দারুণ ঈর্ষাময় ছন্দিত দন্তের ধার
যত-না দেবে সে জ্বালা, তার চেয়ে শান্তি দুর্নিবার
মাংসে-মাংসে ইন্দ্রিয়ের কুঞ্জে আর আত্মার কন্দরে
এনে দেবে। সে-ই কি আমার তবে একান্ত, পরম ?

দ্বিতীয় যাত্রার ক্ষণে আর-বার যেন ক্ষমা না করে কানন !

চন্দ্রাহত সাঙাৎ

দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাৎ
কী ইৎরামি জানে অই চাঁদ
অপেক্ষায় কল্কে জ্বলে গ্যালো, সাঁঝ-রাত
আ-তু আ-তু ডেকে-ডেকে বয়ে গ্যালো
আইলো না উঁচু টিবি থেকে নেমে রূপার মোরগ
ত্রি-ভুবনে কে কোথায় ধরা পড়ে যায় তার নেই ঠিকঠাক্
অখন যখন সব কুয়াশায় ঘুমের মোড়ক
সেই দেখা দিলে ত' সাঙাৎ
আমাগো ঝুলিতে নয়, হায়রে বরাৎ
নোংরা জলে ভেসে এলে যেন পাতিহাঁস
আন্ধা যে সে বান্ধা পড়ে যায় এমন হঠাৎ
কোকিলও মাঝে-মাঝে বনে যায় কাক
মালিক স্বয়ং সত্য করে দেন ফাঁস
অতএব জান্‌তে যদি পারে জ্যান্ত ধীমান বেবাক
চন্দ্রমাই আমার সাঙাৎ !

ধেই ধেই ধেই করতে করতে যাবো

(ঝিনু, খসরু, ইয়াসিন, ইলিয়াস, জামাল)

আন্ধার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়েছি আমরা ক'জন
বিলকুল বেয়াকুফ যুবা পুটলি–পেটেরাহীন
ন্যাংটা নটরাজ ! ধেই ধেই ধেই করতে করতে বলো
পুরোনো বিধ্বস্ত এই হাড্ডি–মাংস নিয়ে
দাঁড়াবো কোথায় কোন নান্–সেঁকা চুলার ভিতর ?

আমাদের চাল নাই, পাতিলও নাই
পিতলের বদ্না নাই
ইয়ারেরা বেরিয়েছি তবু, একদিন ঠিক জেনো
রাত্তির কাবার করে আমরাও পৌঁছামু
অলৌকিক ইমামের কাছে কোন
অদেখা সুনীল ঈদগাহে !

নাকি সে ভরসা নাই ? 'এলাহী, এলাহী' করে তবে
শীর্ণ–পাছা চুলকে–চুলকে কেন মিছা চুলবুলি চটুল চিৎকার
কিসের আহ্লাদ তবে নাগরেরা
চুলের বাদাম–ওড়া ঠাণ্ডা রাতে চাষাড়ে হাওয়ায়
আপাদমস্তক মুড়ে শার্ট–পাত্লুনে, অশ্লীল শব্দের ধ্যানে
কোন জ্ঞান ধরা দেবে আমাদের গুনাগার আন্ধার যৈবনে
কোন আলো এই এক বাঁজা ধুম্সি ভাতার–ছাড়া
মাতারীর মুখর চুম্বনে ?

আমরা কি ধেই ধেই ধেই করতে করতে ঠিক
পৌঁছামু সদলবলে
বিশাল চুলার মধ্যে, লাল মসজিদে ?

অন্ধের উত্তর

'না, শহীদ সেতো নেই; গোধূলিতে তাকে
কখনও বাসায় কেউ কোনদিন পায় নি, পাবে না।
নিসর্গে তেমন মন নেই, তাহলে ভালোই হতো
অন্তত চোখের রোগ সযত্নে সারিয়ে তুলতো হরিৎ পত্রালি।
কিন্তু মধ্য-রাত্রির সশব্দ কড়া তার রুক্ষ হাতের নড়ায়
(যেন দুঃসংবাদ—নিতান্ত জরুরি) আমাকে অর্ধেক স্বপ্ন থেকে
দুঃস্বপ্নে জাগিয়ে দিয়ে, তারপর যেন মর্মাহতের মতন
এমন চিৎকার ক'রে "ভাই, ভাই, ভাই" ব'লে ডাকে,
মনে পড়ে সেবার দার্জিলিঙের সে কি পিছল রাস্তার কথা,
একটি অচেনা লোক ওরকম ডেকে-ডেকে-ডেকে খসে পড়ে
গিয়েছিলো হাজার-হাজার ফিট নীচে।

সভয়ে দরোজা খুলি—এইভাবে দেখা পাই তার—মাঝরাতে;
জানি না কোথায় যায়, কি করে, কেমন করে দিনরাত কাটে
চাকুরিতে মন নেই, সর্বদাই রক্তনেত্র, শোকের পতাকা
মনে হয় ইচ্ছে করে উড়িয়েছে একরাশ চুলের বদলে।

না, না, তার কথা আর নয়, সেই
বেরিয়েছে সকাল বেলায় সে তো—শহীদ কাদরী বাড়ি নেই।'

তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা

উৎসর্গ

পিয়ারীকে

গানগুলো যেন পোষা হরিণের পাল

তোমার চরণ চিহ্নের অভিসারী

রাষ্ট্র মানেই লেফ্‌ট্‌ রাইট লেফ্‌ট্‌

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে স্বাধীনতা দিবসের
সাজোয়া বাহিনী,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার,
কারফিউ, ১৪৪-ধারা,
রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে ধাবমান খাকি
জিপের পেছনে মন্ত্রীর কালো গাড়ি,
কাঠগড়া, গরাদের সারি সারি খোপ
কাতারে কাতারে রাজবন্দী ;
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় মিছিল থেকে না-ফেরা
কনিষ্ঠ সহোদরের মুখ
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় তেজগাঁ
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা,
হাসপাতালে আহত মজুরের মুখ।
রাষ্ট্র বললেই মনে হয় নিষিদ্ধ প্যামফ্লেট,
গোপন ছাপাখানা, মেডিক্যাল
কলেজের মোড়ে 'ছত্রভঙ্গ জনতা —
দুইজন নিহত, পাঁচজন আহত' — রাষ্ট্র বললেই
সারি সারি ক্যামেরাম্যান, দেয়ালে পোস্টার :
রাষ্ট্র বললেই ফুটবল ম্যাচের মাঠে
উঁচু ডায়াসে রাখা মধ্য দুপুরের
নিঃসঙ্গ মাইক্রোফোন

রাষ্ট্র মানেই স্ট্রাইক, মহিলা বন্ধুর সঙ্গে
এনগেজমেন্ট বাতিল,
রাষ্ট্র মানেই পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত
ব্যর্থ সেমিনার
রাষ্ট্র মানেই নিহত সৈনিকের স্ত্রী
রাষ্ট্র মানেই ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়া

রাষ্ট্র মানেই রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা
রাষ্ট্রসংঘের ব্যর্থতা মানেই
লেফ্‌ট্ রাইট, লেফ্‌ট্ রাইট, লেফ্‌ট্ — ।

সেলুনে যাওয়ার আগে

আমার ক্ষুধার্ত চুল বাতাসে লাফাচ্ছে অবিরাম
শায়েস্তা হয় না সে সহজে, বহুবার
বহুবার আমি তাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম
পাড়াতে চেয়েছি। 'বর্গীরা আসছে তেড়ে',
ঘুমাও ঘুমাও বাছা!' কিছুতেই কিছু হয় না যে তার
অনিদ্র সে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সাঁওতাল সর্দার এক
চিকন সুঠাম দেহ আবরণহীন
সে যেন নিশ্চল নিষ্পলক কোনো বিপ্লবীর মতো বহুকাল,
বহুকাল ধ'রে তবু ঝড়েও কাতর নয়
অথবা বৃষ্টিতে নতজানু! সবাই সন্ত্রস্ত, ভীত
এই কালো পাগলা অশ্বের ভয়ে, যদি
টগবগ ক'রে হঠাৎ মাড়িয়ে যায়
ভর-দুপুরের ট্র্যাফিক, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন
হয়ত আহত হবে, উঠতে-বসতে তাই
প্রত্যেকের মুখে, 'বড্ড বেড়ে গেছে, ছেঁটে দাও ওকে'
— বড্ড বেড়েছে সে, নেমে গেছে কানের দু'পাশ থেকে
লুটিয়ে পড়েছে ঘাড়ে ;
আমার উপায় নেই,
আমার চুল সে তবু আমার অধীনে নয়,
নিজেই যে বেড়ে ওঠে, নড়ে, চড়ে
কর্কশ কাকের মতো
ওড়ে ;
নিজস্ব সম্পত্তি ভেবে অপরের নীলিমাকে
ছেঁড়ে খোঁড়ে আর হৃদয়হীনের মতো
অনবরত, অনবরত,
ব্যবহার করে।
সে যেন এখনও ইস্কুল-পালানো ধুলো-বালি-মাখা
অল্প বয়সের ছেলের দঙ্গল

টী-শেপ বলের স্বপ্নে
অযথা হল্লোড়ে ভ'রে আছে —
সে যেন বেয়াড়া খেলোয়াড় সারা মাঠে
একগুঁয়ে আধিপত্যে একাই সম্রাট —
রেফ্রীর বাঁশিও মানবে না।

এই তো আমার চুল
চপল চঞ্চল চুল
কোনোমতে বিব্রত মুণ্ডুতে আমি ধারণ করেছি,
ট্রাফিক-সিগন্যালের মতো নরসুন্দরের,
সবল সচল কাঁচি
সহসা থামাবে তাঁর
বিশৃঙ্খল গতিবিধি, দৌড়-ঝাপ, লাফালাফি।
— তবেই শায়েস্তা হবে ভেবে
শহরের বাছা বাছা সেলুনে গিয়েছি।

চুলের চটুল অহঙ্কার সহনীয় নয় কোনো সুধীমণ্ডলীর কাছে
অতএব খাটো হতে হবে তাকে,
সমাজের দশটা মাথার মতো হ'তে হ'লে, দশটা মাথার মতো
অতএব বেঁটে হ'তে হবে তাকে,
এক মাপে ছাঁটা সুন্দর মসৃণ শান্ত শীতলপাটির মতো
নিঃশব্দে থাকতে হবে শুয়ে
মাথার মণ্ডপে।
তবু সে আমার চুল
অন্ধ
মূক ও বধির চুল মাস না যেতেই
আহত অশ্বের মতো আবার লাফিয়ে উঠছে অবিরাম

শেষ বংশধর

'পিতা, পিতা, পিতা'–ব'লে চীৎকার করছো কেন তুমি,
'বা'জান বা'জান'-ব'লে পাড়া মাৎ ?

তোমার পিতার কাছে ছিলো নাকি এক জোড়া নীল চোখ
স্কন্ধে কোনো টিয়া ?
হস্তধৃত এক ঐন্দ্রজালিক লাটাই
নীলাভ আকাশে–ওড়া শাদা বগার মতন ক্রন্দন–পেরুনো কোনো ঘুড়ি ?
ছিলো নাকি সচ্ছল স্বর্গের চাবি ? রঙবেরঙের কিছু শার্ট ?
আন্ধার পতন কিংবা সূর্যকরোজ্জ্বল
মুসার উত্থান ?

দুর্বিনীত দরবেশের মতো সোনালি বাঘের পিঠে চ'ড়ে
দেখেছেন তেপান্তর তিন দুনিয়ার কূল উপকূল ?
গোড়ালির চাপে তাঁর তরুণ ঘোড়ার মতো ছুটে গেছে প্রাচীন প্রাচীর ?
নাকি আস্তাবলে আজীবন বাঁধা ছিলো সফেদ বোররাক ?
তিনি কি জানতেন সেই অলৌকিক
আশ্চর্য চিচিং ফাঁক
অবলীলাক্রমে যাতে খুলে যায় শীতরাতে নিঃশব্দে দরোজা
তুমি যার বাইরে দাঁড়িয়ে,
স্বপ্নে, জাগরণে বহুকালব্যাপী
ঘন ঘোর দুর্যোগের আবহাওয়ায় ?
তাঁর কাছে ছিলো নাকি বৃষ্টির বিরুদ্ধপক্ষ কোনো মন্ত্রপূত
নরম বর্ষাতি ?

কাকে ডাকছো মিছামিছি ? তুমি ঠিক জানো, তোমার পিতা কি
তোমার মা'য়ের দৃঢ়জানু প্রেমিক ছিলেন ? তাঁর জরায়ুর
অন্ধকারে প্রাণবীজ জ্বলজ্বল ক'রেছিলো কালপুরুষের মতো
নক্ষত্রের ফোঁটায়–ফোঁটায় ?

আর তাঁর বলীয়ান শিশ্নোদর ঘিরে
সন্তদের মাথার মতন জ্যোতির্মণ্ডলও দেখেছেন তিনি ?
তোমার জন্মের উৎস ছিলো নাকি লোকাতীত পরিকল্পনা কারো ?
নির্বিকার, নির্বিচার বিবাহের মনোহীন রীতি ছাড়া অন্য কিছু ?
আরও কিছু ? প্রেম ?

'পিতা, পিতা, পিতা'—ব'লে চীৎকার ক'রছো কেন তুমি
'বা'জান, বা'জান'-ব'লে পাড়া মাৎ ?

অন্য কিছু না

জুঁই, চামেলি, চন্দ্রমল্লিকা, ওরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে
তোমার পলক-না-পড়া কিশোর চোখের জন্যে,
তোমার রক্তের ভেতরে, জনতাকীর্ণ পেভমেন্টে অবলীন
চেতনাচেতনে। অথচ লাল, নীল শার্ট প'রে
বিরুদ্ধ বাতাসে
ভুল স্টেশনের দিকে শিস দিতে দিতে চলেছো যেখানে,
শাদা উরু আর শিশ্নের সঙ্কেত ছাড়া
লাল সিগন্যাল জ্বেলে
কোনো ট্রেন কখনো দাঁড়াবে না।
মসৃণ ত্বকের ওপর নির্ভর ক'রে
বিদেশী ম্যাগাজিনের মতন তুমি
ঝকমকে, ঝলমলে হ'য়ে হাতে-হাতে কদ্দূর যাবে ?

আমি তো স্থির জানি
তোমার ঐ সদ্য তিরিশ-পেরুনো ক্বচিৎ পাকা চুল
— কিছু না,
শরীরের সামান্য শিথিলতা
— কিছু না,

সূর্যাস্তের মতো দেহভার
কিছু না।
মাতৃ-চুম্বনাকাঙ্ক্ষী স্কুল-ফেরা ক্লান্ত কিশোর ছাড়া
এখনও তোমার অস্তিত্ব
অন্য কিছু না।

জুঁই, চামেলি, চন্দ্রমল্লিকা, ওরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে,
প্রিয়জনদের মতো ওরা কেউ নরমাংসভুক নয়
বন্ধুদের দৃষ্টির মতো ওরা কেউ তলোয়ারের

পৃষ্ঠপোষক নয়
কৈশোরিক চোখের ছায়ায় ওদের ঢেকে দাও,
কেননা আমি তো স্থির জানি,
অসংখ্য বিদ্রূপ-বেঁধা, পিতার বিশালবক্ষপ্রার্থী,
রুক্ষ চুলের এক বেদনাব্যাকুল বালক ছাড়া
তুমি আজও,
আজও,
অন্য কিছু না।

স্কিৎসোফ্রেনিয়া

চারদিকে বিস্ফোরণ করছে টেবিল,
গর্জে উঠছে টাইপ রাইটার,
চঞ্চল, মসৃণ হাতে বিশ্বস্ত সেক্রেটারীরা
ডিক্টেশন নিতে গিয়ে ভুলে গেছে শব্দ-চিহ্ন,
জরুরী চিঠির মাঝামাঝি
জাহাবাজ ব্যাপারীর দীপ্ত জিহ্বা
হেমন্তের বিবর্ণ পাতার মতো ঝ'রে গেছে
বর্ণমালাহীন শূন্যতায়, —
পেটের ভেতরে যেন গর্জে উঠছে গ্রেনেড,
কার্বাইনের নলের মতো হলুদ গন্ধক-ঠাসা শিরা,
গুনাগার হৃদয়ের মধ্যে ছদ্মবেশী গেরিলারা
খনন করছে গর্ত, ফাঁদ, দীর্ঘ কাঁটা বেড়া।
জানু বেয়ে উঠছে একরোখা ট্যাঙ্কের কাতার,
রক্তের ভেতর সাঁকো বেঁধে পার হলো
বিধ্বস্ত গোলন্দাজেরা,
প্রতারক ক'টা রঙহীন সাব-মেরিনের সারি
মগজের মধ্যে ডুবে আছে,
সংবাদপত্রের শেষ পৃষ্ঠা থেকে বেরিয়ে এসেছে
এক দীর্ঘ সাঁজোয়া-বাহিনী
এবং হেডলাইনগুলো অনবরত বাজিয়ে চলেছে সাইরেন।

একটি চুম্বনের মধ্যে সচীৎকার ঝলসে গেল কয়েকটা মুখ,
একটি নিবিড় আলিঙ্গনের আয়ুকালে
৬০,০০০,০০ উদ্বাস্তুর উদ্বিগ্ন দঙ্গল
লাফিয়ে উঠলো এই টেবিলের'পর ;
বেয়োনেটে ছিঁড়ে যাওয়া নাড়ি-ভুঁড়ি চেপে,
বাম-হাতে রেফ্রিজারেটর খুলে পানি খেলো
যে-লোকটা, তাকে আমি চিনি,

কতবার তার সাথে
আমার হ'য়েছে দেখা
পত্রিকার ষ্টলে
প্যান-আমেরিকানের বিজ্ঞাপনে,
টাইম ম্যাগাজিনের
মসৃণ পাতায় কিম্বা
সিনেমায় কোনো ক্যাপ্টেনের নিপুণ ভূমিকায়।

আমি তাই মহা-উল্লাসে
নেমন্তন্ন করলাম তাকে
আমাদের প্রাত্যহিক ভোজনোৎসব —

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে সুখাদ্যের ধোঁয়া
কেননা এক বাঁচাল বাবুর্চির
সবল নেতৃত্বে
আর সুনিপুণ তত্ত্বাবধানে
আমাদের সচ্ছল কিচেনে
অনর্গল রান্না হ'য়ে চলেছে আপন-মনে
নানা ধরনের মাংস —
নাইজেরিয়ার, আমেরিকার, সায়গনের, বাংলার
কালো, শাদা, এবং ব্রাউন মাংস।

একবার শানানো ছুরির মতো

একবার শানানো ছুরির মতো তোমাকে দেখেছি
হিরণ্ময় রৌদ্রে জ্বলজ্বলে
যেখানে মাংসের লালে
শিউরে উঠছে আমার সত্তার সখ্যতা —
সেইখানে, সোনালি কিচেনে তুমি
বসন্তের প্রথম দিনেই হত্যা করেছিলে আমাকে তোমার
নিপুণ নিরিখে।

যে রুটিতে ঝরে না ঝর্ণার মতো, মেশে না তোমার
স্তনের লবণ আমি তাকে কোথাও দেখি না,
খুঁজি না কখনো। তোমার বিহ্বল হ্রদ ছাড়া
আর কোনো স্নানও জানি না। তোমার দেয়ালে
শ্রাবণ লেখে না গল্প, বৃষ্টি দাঁড়ায় না কোনোদিন
অপরূপ অক্ষরের মতো। তোমাকে পড়ি না আর
অশ্ব, অজগর কিম্বা আমের আদলে ; অলীক ভ্রমর
রটায় না আপন গুঞ্জন কোনোদিন তোমার মাইক্রোফোনে।

আমি তাই নির্বিঘ্নে টানানো নিঃশব্দ পোস্টারগুলো পড়ি
পোস্টার, পোস্টার, পোস্টার, পোস্টারগুলো পড়ি,
পোস্টারের লাল–নীল–কালোগুলো পড়তে পড়তে
মেধা, মজ্জা, হাড়গোড়সুদ্ধ ট'লে প'ড়ে যাই
সেইখানে, সোনালি কিচেনে বসন্তের প্রথম দিনেই
যেখানে আমাকে তুমি হত্যা করেছিলে।

বৈষ্ণব

শাদা রাস্তা চ'লে গেছে বুকের মধ্যে
পাতার সবুজ সম্মিলিত কাঁচা শব্দে
যে তোমাকে ডেকেছিলো 'রাধা',
আধখানা তার ভাঙাগলা, আধখানা তার সাধা।

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের চৈতন্যপ্রবাহে তুমি ট্রাফিক আইল্যাণ্ড
হে রবীন্দ্রনাথ !
দাঁড়িয়ে আছো যেন
সোনালি, অক্ষম পুলিশ এক,
সর্বদা জ্বলছে তোমার লাল, নীল, সবুজ
সিগন্যাল,
বাংলাদেশ নামে একফোঁটা অচেনা স্টেশনে
পৌঁছুতে হ'লে
নিজের সমস্ত বিষয়-আশয় বেচে দিয়ে
তোমার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে নাকি
আমার টিকিট ?

তোমার স্বদেশে, কবি, আমরা কয়েকজন
ট্যুরিস্টের মতো আজো
ঘুরছি ফিরছি
ড্রাগস্টোরের আশপাশে,
ঝুলিয়ে স্টেথিসকোপ নিঃশব্দে তুমি হেঁটে গেছো
কিছুক্ষণ আগে ;
অথচ করিডোরের সারি সারি টুল-বেঞ্চির ওপর
আমিও ছিলাম ব'সে
অচিকিৎস্য রোগীদের মলিন কাতারে।

হে অলীক ডাক্তার, তুমি আমাদের
ডাক-বিভাগ থেকে
পাও নি আমার পোস্টকার্ড কোনো ?
আমি তো এক তোড়া চিঠি লিখে
প্রাঞ্জল ভাষায়
ব্যামোর বর্ণনাগুলো সযত্নে দিয়েছি।

ভ্রূক্ষেপ করো নি তুমি, তবু জনশ্রুতি
যেহেতু সহায়
আমি তাই তোমাকে এক আলমিরা
নিদ্রার বর্ণালি বড়ি ভেবে শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত রাতে
নির্ভয়ে বাড়িতে ফিরে
জামা-না-খুলেই
নিঃশব্দে চিৎপাত হয়ে
রাতভর দেখেছি কেবল ওষুধের শিশির মতন
নক্ষত্রের উজ্জ্বল তরল
ফোঁটায়-ফোঁটায়
ঝ'রে পড়ছে ঠোঁট-তালু-জিহ্বাহীন বধির ফুটপাতে।

জানি, চিকিৎসক নও তুমি
কিম্বা ড্রাগস্টোরের কোনো ওষুধ বিক্রেতা ;
দিনের শুরুতে তুমি,
মিশে আছো অন্ত্রের অম্লরসে,
অনিদ্র রাতের ভোরে যেন টেবিলে সাজানো প্রাতঃরাশ
মেধার ভেতরে তুমি, মজ্জায়, শিরায়, মর্মে
ওৎ পেতে
শিকারী বেড়ালের মতো
নিয়ে গেছো আমাদের সবগুলো সোনালি-রূপালি মাছ ;
রবিনহুডের মতো লুট ক'রে
আমাদের বিব্রত বাণিজ্যালয়, বিস্ফারিত ব্যাঙ্ক
সব টাকা-পয়সা ফের বিতরণ ক'রে দিলে
যে ফকির মিসকিনের ভীড়ে,
আমি সেই মিছিল থেকে খ'সে প'ড়ে
একটি চকচকে টাকা
আঙুলের নিপুণ তুড়িতে গীটারের মতো
বাজিয়ে চলেছি
যেখানে —
তুমি সে রাতের পার্কে আমার আলো-জ্বলা
অন্তিম রেস্তোরাঁ !

বাংলা কবিতার ধারা

কে যেন চীৎকার করছে প্রাণপণে 'গোলাপ । গোলাপ ।'
ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়ছে তার সুমসৃণ লালা,
'প্রেম, প্রেম' ব'লে এক চশমা-পরা চিকণ যুবক
সাইকেল-রিকশায় চেপে মাঝরাতে ফিরছে বাড়ীতে,
'নীলিমা, নিসর্গ, নারী' — সম্মিলিত মুখের ফেনায়
পরস্পর বদলে নিলো স্থানকাল, দিবস শর্বরী হলো
সফেদ পদ্মের মতো সূর্য উঠলো ফুটে গোধূলির রাঙা হ্রদে
এবং স্বপ্নের অভ্যন্তরে কবিদের নিঃসঙ্গ করুণ গণ্ডদেশে
মহিলার মতো ছদ্মবেশে জাঁদরেল নপুংসক এক
ছুঁড়ে মারলো সুতীক্ষ্ণ চুম্বন।

কবিতা, অক্ষম অস্ত্র আমার

স্টেনগান গর্জনের শব্দে পাখিরা ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে যায়,
বিকলপক্ষ কবিতা আমার তুমি এই জর্নালের মধ্যে,
কখনো অন্ধকার দেরাজে
গুটিশুটি মেরে মুখ বুজে
প'ড়ে আছো — যেন মৃত রাজহাঁস,
নাকি কার্তুজশূন্য, জং-ধরা
ব্যবহারের অযোগ্য কোন প্রাচীন পিস্তল। অথচ তবুও
তোমার মমতা আমি কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। যেদিন অচেনা
কয়েকটা গলা আর ভারি ট্রাকের আওয়াজ মাড়িয়ে
কুচকাওয়াজ-ভরা সন্ত্রাসে কেঁপে উঠলো এ তল্লাট
সার্চ-লাইটের আলোয়,
তখন যদিও ছিলো না অস্ত্র আমার কাছে, তবু ভয়ে
কেঁপে উঠেছিলো সারা বাড়ি। কিন্তু আমি,
কাপুরুষ, ভীরু, এই আমি অসীম সাহসে
চকচকে সঙীনবিদ্ধ হ'তে দিই নি তোমাকে
এমনকি তোমার অগ্ন্যুৎসবেও হই নি সহায়।

স্বাধীনতার সৈনিক যেমন উরুতে স্টেনগান বেঁধে নেয়,
কিম্বা সন্তর্পণে গ্রেনেড নিয়ে হাঁটে,
তেমনি আমিও
গুপ্তচরের দৃষ্টির আড়ালে অতি যত্নে লুকিয়ে রেখেছি
যেন তুমি নিদারুণ বিস্ফোরণের প্রতিশ্রুতিতে
খুব বিপজ্জনক হ'য়ে আছো।

মনে আছে একদিন রাত্রে বাগানের মাটি খুঁড়ে
তোমাকে শুইয়ে দিয়েছি খুব যত্নে। কিন্তু যখন
কয়েকটা বিদেশী ভারি বুট তোমাকে
অকাতরে মাড়িয়ে কড়া নাড়লো দরোজায়

তুমি কিন্তু মাইন-এর মতো প্রতিরোধে
বিস্ফোরণ করো নি।

হে আমার শব্দমালা, তুমি কি এখনও বৃষ্টি-ভেজা
বিব্রত কাকের মতো
আমার ক্ষমতাহীন ডাইরির পাতার ভেতরে বসে নিঃশব্দে ঝিমুবে,
তাহ'লে তোমার ধ্যানে আবাল্য দুর্নাম কিনে আমি
অনর্থক বড়াই করেছি।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনিদ্রা এবং অস্থির জাগরণ ছাড়া তুমি কিছু নও,
কপালে দাও নি তুমি রাজার তিলক কিম্বা প্রজার প্রতিশ্রুতি
তবে কেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছি তোমার পদমূলে ।

বরং এসো করমর্দন ক'রে যে যার পথের দিকে যাই,
তবু আরো একবার বলি :
যদি পারো গর্জে ওঠো ফীল্ডগানের মতো অন্তত একবার ...

নিষিদ্ধ জর্নাল থেকে

ভোরের আলো এসে পড়েছে ধ্বংসস্তূপের ওপর।

রেস্তোরাঁ থেকে যে ছেলেটা রোজ
প্রাতঃরাশ সাজিয়ে দিতো আমার টেবিলে
তে-রাস্তার মোড়ে তাকে দেখলাম শুয়ে আছে রক্তাপ্লুত শার্ট প'রে,
বন্ধুর ঘরে যাওয়ার রাস্তায় ডিআইটি মার্কেটের ভস্মাবশেষ,
প্রতিরোধের চিহ্ন নিয়ে বিবর্ণ রাজধানী দাঁড়িয়ে রয়েছে,
তার বিশাল করিডোর শূন্য।

শহর ছেড়ে চলে যাবে সবাই
(এবং চলে যাচ্ছে দলে দলে)
কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ স্পর্শ ক'রে আমরা কয়েকজন
আজীবন র'য়ে যাবো বিদীর্ণ স্বদেশে, স্বজনের লাশের আশেপাশে।
তাই তার দেখা পাবো ব'লে দানবের মতো খাকি ট্রাকের
অনুর্বর উল্লাস উপেক্ষা ক'রে, বিধ্বস্ত ব্যারিকেডের পাশ ঘেঁষে
বেরিয়েছি ২৭শে মার্চের সকালে কান্নাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে
পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলায়,
যে শিলা অন্তিম প্রতিজ্ঞায় অন্তত
প্রাথমিক অস্ত্র হ'তে জানে। তেমনি এক শিলার আঘাতে
বিনষ্ট হয়েছে আমার বুকের অনিদ্র ভায়োলিন।

ধ্বংসস্তূপের পাশে, ভোরের আলোয়
একটা বিকলাঙ্গ ভায়োলিনের মতো — দেখলাম তে-রাস্তার মোড়ে
সমস্ত বাংলাদেশ পড়ে আছে আর সেই কিশোর, যে তাকে
ইচ্ছের ছড় দিয়ে নিজের মতো ক'রে বাজাবে ব'লে বেড়ে উঠছিলো
সেও শুয়ে আছে পাশে, রক্তাপ্লুত শার্ট প'রে।
তবে কি এই নিয়তি-আমাদের, এই হিরণ্ময় ধ্বংসাবশেষ,
এই রক্তাপ্লুত শার্ট আজীবন, এই বাঁকাচোরা ভাঙা ভায়োলিন ?

মধ্য-দুপুরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, একটা তন্ময় বালক
কাঁচ, লোহা, টুকরো ইট, বিদীর্ণ কড়ি-কাঠ, একফালি টিন
ছেঁড়া চট, জং ধরা পেরেক জড়ো করলো এক নিপুণ
ঐন্দ্রজালিকের মতো যত্নে
এবং অসতর্ক হাতে কারফিউ শুরু হওয়ার আগেই
প্রায় অন্যমনস্কভাবে তৈরি করলো কয়েকটা অক্ষর : 'স্বা-ধী-ন-তা।'

মাংস, মাংস, মাংস . . .

আমাকে রাঙাতে পারে তেমন গোলাপ
কখনও দেখি না। তবে কাকে, কখন, কোথায়
ধরা দেবো ? একমাত্র গোধূলি বেলায়
সবকিছু বীরাঙ্গনার মতন রাঙা হয়ে যায়।
শৈশবও ছিলো না লাল। তবে জানি,
দেখেছিও, ছুরির উজ্জ্বলতা থেকে ঝ'রে পড়ে বিন্দু বিন্দু লাল ফোঁটা

তবে হাত রাখবো ছুরির বাঁটে ? সবুজ সতেজ —
রূপালি রেকাবে রাখা পানের নিপুণ কোনো খিলি নয়,
মাংস, মাংস, মাংস . . . মাংসের ভেতরে শুধু
দৃঢ়মুখ সার্জনের রূঢ়তম হাতের মতন
খুঁজে নিতে হবে সব জীবনের রাঙা দিনগুলি . . .

পাখিরা সিগন্যাল দেয়

ইদানীং আমার সমস্ত আস্থা পাখিদের স্বাস্থ্যের ওপর,
শালিক, চড়ুই কিম্বা কাক ছাড়া কারো চোখ বিশ্বাস করি না,
পাখিদের সন্ত্রস্ত চীৎকার ব্যতিরেকে শুভাকাংক্ষী কাউকে দেখি না,
সারাক্ষণ এভিন্যুর প্রত্যেকটি বাঁকে কেবল ওরাই থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে
হোটেল, রেস্তোরাঁ কিম্বা ব্যাঙ্ক অথবা টেলিগ্রাফের তারে, ছাদে
জানালায়, শার্সিতে, বারান্দায়, বুলেভারে রাস্তায় অথবা ফুটপাথে
অপেক্ষমাণ ডাক্তার অথবা দ্রুতগতি, শীতল নার্সের মতো নিরন্তর
কেবলই পাখিরা থাকে, লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটে, ওড়ে কিম্বা বসে।

পাখিদের সতর্ক চীৎকারে টের পাই আমি
কখন, কোথায়, কোন্ পথে
কোন সব রক্তাক্ত স্ট্রীটের বাঁকে
আর্মার্ড-কার নিয়ে কাতারে কাতারে কারা
দাঁড়িয়ে রয়েছে : কার্বাইনের চকচকে উদ্যত নল
নীলরঙা আকাশের নীচে,
ঝলমলে শীতের দুপুরে
কার দিকে সুনিপুণ তাক ক'রে আছে,
কে কোথায় গড়াচ্ছে কোন্ পাঁচিলের পাশে
সদ্য গুলিবিদ্ধ কারা নদীর ভেতর থেকে
বুদ্বুদের ভাষায় প্রতিবাদ লিখে পাঠাচ্ছে বারবার
সকালে, দুপুরে কিম্বা সন্ধ্যায়
সব কিছু ব'লে দেয় পাখির চীৎকার !

চেকপোস্টের কাছে দীর্ঘ কিউ — নতমুখে দেহ-তল্লাশির পর
দোকান খুলবে কেউ, আপিস পাড়ায় যাবে কিম্বা ফিরবে ঘর।
মাথার ওপরে শুধু ক'টা পাখি উপেক্ষা করছে সব মানা
অসম্ভব স্বাধীনতায় আকাশে উড়্ডীন দেখি
আইডেন্টিটি কার্ডহীন ডানা ॥

গোলাপের অনুষঙ্গ

'Oh, rose thou art sick'

— William Blake

একটা মেয়ে খোঁপায় তার কোমল লাল গোলাপ
ছুরিতে বেঁধা কলকাতার শানানো ফুটপাতে
দেখেছিলাম ছেলেবেলায় ম্যানহোলের পাশে
রয়েছে প'ড়ে স্তনের নীচে হা-খোলা এক ক্ষত
হুবহু এই লাল গোলাপের মতো।
আজকে তাই তোমার দেয়া কোমল লাল গোলাপ
তীক্ষ্ণ হিম ছুরির মতো বিঁধল যেন বুকে॥

ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়

একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনও উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা

জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়। তারপর তোমার উন্মুক্ত প্রান্তরে
কাতারে কাতারে কত অচেনা শিবির, কুচকাওয়াজের ধ্বনি,
যার আড়ালে তুমি অবিচল, অটুট, চিরকাল।

যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ — রক্তপাতে আর্তনাদে
হঠাৎ হত্যায় ভ'রে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
অথচ সেই প্রান্তরেই একদা ধাবমান জেব্রার মতো

জীবনানন্দের নরম শরীর ছুঁয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস বাতাস বয়েছে।
এখন সেই বাতাসে শুধু ঝলসে যাওয়া স্বজনের
রক্তমাংসের ঘ্রাণ এবং ঘরে ফিরবার ব্যাকুল প্ররোচনা।

শৃংখলিত বিদেশীর পতাকার নীচে এতকাল ছিলো যারা
জড়োসড়ো, মগজের কুণ্ডলীকৃত মেঘে পিস্তলের প্রোজ্জ্বল আদল
শীতরাতে এনেছিলো ধমনীতে অন্য এক আকাঙ্ক্ষার তাপ।

আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিলো নিদারুণ নির্বিকার,
সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,
ব্ল্যাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি :
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হ'য়ে
নিজেদের ঘরে।

স্বাধীনতার শহর

ক্রাচে ভর দিয়ে, দেখলাম, সে হাঁটছে চৌরাস্তায়,
একটা বল নিয়ে হুল্লোড় করতে করতে
একদল ছেলে
ভোরবেলাকার লাল আলোর ভেতর ঢুকে গ্যালো
সবচেয়ে বদ-মেজাজী রোগা লোকটা
স্বর্গোজ্জ্বল হাসির আভায়
পতাকা হাতে দাঁড়িয়েছে হাওয়া-লাগা ঠাণ্ডা বারান্দায়।

বাতাসে চুল উড়িয়ে
প্যান্টের পকেটে হাত রেখে আমিও এখন নেমেছি রাস্তায়,
দেয়ালের পোস্টারগুলো সকালের হিরণ্ময় রৌদ্রে
নিবিষ্ট মনে পড়তে পড়তে চ'লে যাবো —
স্বাধীনতা, তুমি কাউকে দিয়েছো সারাদিন
টো-টো কোম্পানীর উদ্দাম ম্যানেজারী করার সুবিধা
কাউকে দিয়েছো ব্যারিকেডহীন দয়িতার ঘরে যাওয়ার রাস্তা
কাউকে দিলে অবাধ সম্পাদকীয় লেখার অপরূপ প্ররোচনা
উজ্জ্বল কিশোরকে ফের কবিতার আঁতুড় ঘর, মেঘের গহ্বর,
আর আমাকে ফিরিয়ে দিলে
মধ্যরাত পেরুনো মেঘলোকে ডোবা সকল রেস্তোরাঁ
স্বাধীনতা, তোমার জরায়ু থেকে
জন্ম নিলো নিঃসঙ্গ পার্কের বেঞ্চি,
দুপুরের জনকল্লোল
আর যখন-তখন এক চক্কর ঘুরে আসার
ব্যক্তিগত, ব্যথিত শহর, স্বাধীনতা!

নীল জলের রান্না

কিছু লাল মোটা চাল ছুঁড়ে মারলে মুখে,
'যা, রেশনের দোকানে লাইন দে গে যা।'

হ্যাঁ, যাবোই তো। আমার কার্ডের যা প্রাপ্য
আমি তা নিয়েই ফিরবো, তা ছাড়া উপায় নেই।
কিন্তু এখনও যেহেতু তৈরি হয় নি
চিহ্নপত্র আমি তাই জানিও না
কতোটা বাতাস আছে আমার ভাগে,
কয় সের চিনির মতো শুভ্র তারার ফেনা,
সমুদ্রের নীল জল কয় পাঁইট!

শুনেছি রেশনের কাউন্টারের সেই ভীষণ বিক্রেতা
লোক বুঝে জিনিশ দেয়, কেউ পায়
সরু, মিহি, শাদা, কেউ শুধু
লাল, মোটা চাল — আমি তো তা-ই চাই
আমার হাতের তালুতে শ্বেত শুভ্র জ্যোৎস্না-কণার মতো
শাদা চাল নিমেষে শুকিয়ে যাবে। পাখির মাংসও আজ আর
পছন্দ করি না। প্রতিহিংসাপরায়ণ দাঁত
আহ্লাদে লবণাক্ত হয়, লাল চক্ষু মহিষের মাংসময় উরু দেখে
আবাল্য অভ্যস্ত আমি — যাবো — রেশনের দোকানেই আমি যাবো।
আমারও ঘরে উনুনের উৎসব শুরু হবে। পড়শিদের সচকিত ক'রে
আমিও নীল জলে লাল চাল রান্না ক'রে নেবো।

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন ?

চেয়ার, টেবিল, সোফাসেট, আলমারিগুলো আমার নয়
গাছ, পুকুর, জল, বৃষ্টিধারা শুধু আমার
চুল, চিবুক, স্তন, উরু আমার নয়,
প্রেমিকের ব্যাকুল অবয়বগুলো আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
কবিতার লাবণ্য দিয়ে নিজস্ব প্রাধান্য বিস্তার
অন্তিমে উদ্দেশ্য যার ?

কুচকাওয়াজ, কামান কিম্বা সামরিক সালাম নয়
বাগানগুলো শুধু আমার
মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক সাহায্য তহবিল নয়
মিল–অমিলের স্বরবর্ণগুলো শুধু আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
পররাষ্ট্রনীতির বদলে প্রেম, মন্ত্রীর বদলে কবি
মাইক্রোফোনের বদলে বিহ্বল বকুলের ঘ্রাণ ?

টেলিফোন নয়, রেডিও নয়, সংবাদপত্র নয়
গানের রেকর্ডগুলো আমার
ডিক্টেশন নয়, সেক্রেটারি নয়, শর্টহ্যাণ্ড নয়
রবীন্দ্রনাথের পোর্ট্রেটগুলো আমার

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো
জেনারেলদের হুকুম দেবেন রবীন্দ্রচর্চার ? মন্ত্রীদের
কিনে দেবেন সোনালি গীটার ? ব্যাঙ্কারদের
বানিয়ে দেবেন কবিতার নিপুণ সমঝদার ?

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো ?
গীতবিতান ছাড়া কিছু রপ্তানি করা যাবে না বিদেশে
হ্যারিবেলাফোন্তের রেকর্ড ছাড়া অন্য কোনো আমদানি,
প্রতিটি পুলিশের জন্যে আয়োনেস্কোর নাটক
অবশ্য পাঠ্য হবে,
সেনাবাহিনীর জন্যে শিল্পকলার দীর্ঘ ইতিহাস ;

রাষ্ট্রপ্রধান কি মেনে নেবেন আমার প্রস্তাবগুলো,
মেনে নেবেন ?

ভয়ে ভয়ে সারাদিন কেটে যায় ; এমন কি ইদানীং
উপবিষ্ট হতে ভয় লাগে, কেননা তেমন অনুগত,
বিশ্বস্ত চেয়ার আর কখনো দেখি না কারো
করতলগত হ'য়ে পোষ-মানা বাঘের মতন ব'সে আছে,
তেমনি নির্ভরযোগ্য টুল — কিম্বা বেঞ্চি নেই যেখানে আমার
পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি শরীর খুব সাবলীলভাবে দু'দণ্ড জিরোবে,
এমন আসন পাবে যার পাশে অন্তত থাকতে পারে
আমার সন্তান কিম্বা একরাশ তারা-পোরা সন্ধ্যার শহর
অথবা অত্যন্ত উঁচু মঞ্চ কোনো অনায়াসে এঁটে যায় — এমন চেয়ার —
যেখানে মাইক্রোফোনে সারাদিন তরুণ কবির কণ্ঠ
যথার্থ অরুণোদয়ে ভ'রে দেবে আমাদের তামস হৃদয় ;
তেমন উল্লেখযোগ্য, জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের উপাদানে গ'ড়ে-ওঠা
হিরণ্ময় চেয়ার কোথাও কোনোদিন আমি পাবো নাকি !
একদা যেমন একবার পেয়েছিলাম অসীম লাবণ্যে-ভরা
সমুদ্র-সংলগ্ন এক সোনালি চেয়ার — ছিলো না হাতল,
একরোখা চুম্বনের মতো তবু তাকে আমি সরাতে পারি নি
ঠোঁটের কিনারা থেকে, নীলাভ শৈশবে সে আমার অদম্য জাহাজ।

আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই সাবলীল সমুদ্রের বিহ্বল জাহাজ,
সেই জাহাজের রাত্রিময় ডেকে হীরে-জ্বলা একাকী চেয়ার
আমি আরো একবার বাতাসে উড়িয়ে চুল উপবিষ্ট হ'তে চাই ॥

বন্ধুদের চোখ

ইদানীং আমার বন্ধুদের চোখ, আমার বন্ধুদের চোখ ইদানীং
চোখে-চোখে রাখে শুধু চোখে চোখে ঈগলচক্ষু বন্ধুরা আমার
আর আমি ঠাঠা রৌদ্রে ঠাটারীবাজার মাৎ করে চঞ্চল চোখের
কালো চকচকে চোখে ঝুলছি বাসি-মাংস ইদানীং
চোখে চোখে ঠাঠা রৌদ্রে ঠাটারীবাজারে কাৎ হ'য়ে
বাসি মাংস ইদানীং প'ড়ে আছি বন্ধুদের ঈগলচক্ষু চোখের
ভেতরে চোখে —
চোখে-চোখে রৌদ্রের ভেতরে আমি মাংস চকচকে
মাছির ময়লা গুঞ্জনের ভেতর প'ড়ে আছি, বন্ধুদের চোখের গুঞ্জনে
গুঞ্জনের ময়লার মধ্যে আমি গুঞ্জিত মাংসের চাকা
বন্ধুদের চোখে ঝুলছি বন্ধুদের চঞ্চু থেকে ঝুলছি বাতাসে
বন্ধুদের গন্ধভরা বিবর্ণ বাতাসে আমি গুঞ্জিত মাংসের চাকা
মহানন্দে ঝুলছি আমি, দ্যাখো দ্যাখো ঝুলছে নীলশিরা !
আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর চোখ
টেবিলের ওপরে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে
অপলক চোখে টিক-টিক-টিক ক'রে বেজে চলেছে
আমার হৃৎ-
স্পন্দনে
এবং চঞ্চল চোখে দপ্ দপ্ দপ্ ক'রে
মস্তকে
কিম্বা
কব্জির শিরায়
আমার সবচেয়ে প্রিয়বন্ধুর চোখ
টিক-টক টিক-টক ক'রে বেজে চলেছে
আমার চতু-
র্দিকে
এবং চঞ্চল চোখে তাকিয়ে দেখছে
আমার ওঠা

বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা
বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা
বারান্দার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা

আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর চোখ
প্রিয়তম
বন্ধুর
চোখ
সশব্দে ঢং ঢং ঢং ক'রে বেজে চলেছে
ডি.আই.টির চূড়ায়
এবং সবাইকে জানান দিচ্ছে
আমার
পরিণাম —
এবং
পরিণতি
আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর চোখ।

ছুরি

সবকিছুই বিঁধতে জানে ছুরির মতো,
শাদা মোরগ চঞ্চুতে তার বিদ্ধ করে শস্যকণা
চামড়া ছিঁড়ে সূর্য জ্বলে
ঈগলগুলোর দারুণ নখে ইঁদুর আসে অনায়াসে
পুকুর জুড়ে রূপালি মাছ লাফিয়ে ওঠে
বড়শী-গাঁথা

কারো কারো বুকের মধ্যে
চাঁদের ফলা আমূল ব'সে রক্তপাত যে হঠাৎ ঘটায়
আত্মজনের প্রতিশোধের স্পৃহার ধারে
কাটামুণ্ড নৃত্য করে
গোধূলিতে যখন তখন হায় আমাদের দুপুর রাঙে
রাত্রি রাঙে, আঁধার রাঙে
জলও আপন স্রোতের ভেতর লক্ষ কোটি বর্শা পোষে
গ্রামও ভাঙে নিপুণ করাত গাছ কেটে নেয়
হীরের ধারে অস্ত্র ছেঁড়ে,
গোলাপ হানে দারুণ মরণ
কবির কোমল আঙুলটিরে,
পায়রা-নখের নরম-স্মৃতি
কাঁধের ওপর কামড়ে বসা, কেউ কি ভোলে ?
ভালোবাসার কালো চুলের, তীক্ষ্ণ কামের
সফেদ স্তনের পীনোন্নত চূড়ায় বেঁধা
শহীদ প্রেমিক কাৎরে ওঠে,
আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণের নিপুণ ছুরি
পিঠের হাড়ে নিয়ে যেমন ট'লে পড়ে
বিপ্লবী তার পথের শেষে ;
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
তীক্ষ্ণ কালো ছুরির মতো চতুর্দিকে বৃষ্টি পড়ে !

এই সব অক্ষর

আমি এখন তোমার নাম লিখবো,
আমি এখন তোমার নাম লিখবো ;

তোমার নাম লেখার জন্যে আমি
নিসর্গের কাছ থেকে ধার করছি বর্ণমালা —
আগুন, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, ঝড় — আর,
সভ্যতার কাছ থেকে — একটি ছুরি
— এই সব অক্ষর দিয়ে তোমার নাম আমি লিখছি, তোমার নাম :
অগ্নিময় বৃষ্টিতে ভুমি ঠাণ্ডা, হিম, সোনালি ছুরি প্রিয়তমা !

গাধা-টুপি প'রে

কেউ বললো, এই তো কয়েক ফার্লং
কেউ বললো, আরো পাঁচ ক্রোশ সোজা যেতে হবে
কেউ বললো, মাইল-মাইল ব্যবধানে তুমি আছো।

সে কোন সকালে আমি বেরিয়ে পড়েছি কয়েক টুকরো রুটি নিয়ে একা।
পৈতৃক সম্পত্তিরূপে পাওয়া বাল্যকালে প্রোজ্জ্বল বন্দুক
যার নল দুটো তোমার চোখের চেয়ে কালো এবং গভীর তো বটেই ;
সেই বন্দুকটিও ফেলে এসেছি তোমার বাগানের এন্তার জ্যোৎস্নায়
— শাদা চাঁদের নীচে কালো বন্দুক আমার ।
(যদিও বললাম 'তোমার বাগান' আমি, কিন্তু ঠিক জানি
বাগান তোমার নয় অথচ বাগান,
যে কোন বাগান
আমার কেবল তোমার বাগান ব'লে মনে হয়।)

ইতিমধ্যে দু'দশটা বাগান খুঁজে
চলে এসেছি, তাই বা কি করে বলি।
একচোট খানাতল্লাশিও হয়ে গেল গোলাপের
এমনকি গাধার পিঠেও চড়ে যেতে হলো অনেক দূর,
অসংখ্য নিবিড় রাত্রি বাদামের উষ্ণ গন্ধের ভেতর মিশে গেল।

আমার মত ভীরু সাঁতার-না-জানা লোক
পার হলো নদী —
এটাই নিয়তি।
অন্যরকম পরিণামও যে দেখি নি এমন নয়
— সাঁতারু জাঁদরেল ক্যাপটেন এক জাহাজসুদ্ধ ডুবে গেল
— ঊর্ধ্বাকাশ থেকে বোয়িং-৭০৭ অজগ্রামে পুকুরে তলালো
কিন্তু নদী পার হয়ে আমি কি গন্তব্যে পৌঁছুলাম ?

কেউ বলছে, এই তো কয়েক ফার্লং
কেউ বলছে, আরো পাঁচ ক্রোশ সোজা যেতে হবে
কেউ বলছে, তিতিরের মতো তোমাকে শিকার করা কখনো যাবে না
কেউ বলছে, বন্দুকের গুলি নাকি সিন্দুকের তালা খুলবে না
কেউ বলছে, বাগানগুলো চৌধুরী সাহেবদের (তোমার নয় মোটেই)
কেউ বলছে, গাধা-টুপি মাথায় পরলে সব ল্যাটা চুকে যাবে।

আইখম্যান আমার ইমাম

ক্লাবগুলো আবার ঝকঝক করছে
দুর্ভিক্ষ, মারী, বন্যা অথচ
বৃষ্টি নেই ;
শ্রাবণে খরা,
আষাঢ়েও বালি জ্বলছে,
টলে পড়ছে পাতার জলের মতো
গ্রামগুলো নদীর ভেতর
তিন চার দিন হলো ঘুম নেই,
রাতেও, হেঁটে বেড়াচ্ছি তবুও
গুপ্তঘাতক-ভরা
শহরের আনাচে কানাচে
তিন চার দিন হলো,
একটা ছুরি খাওয়া কিশোর
পুকুর-বসানো আর্থটির মতো পার্কে
প'ড়েছিলো (তিন চার দিন হলো)
দেয়ালে নতুন পোস্টার
শাসাচ্ছে সবাইকে —
আমাকেও,
মনে পড়লো
মাথার ওপর বি-৫২ বিমানের
দিকে তাকিয়ে দৌড়ুচ্ছে তিনজন কিশোর
— কিউবার একটা দুর্লভ কাগজে
দেখেছিলাম হ্যানয়ের একটা ছবি
মনে পড়লো
র‍্যাপার জড়িয়ে ট্রেঞ্চে ছিলাম
এইতো সেদিন ব্ল্যাকআউটের রাত্রে —
আমিও,
মনে পড়লো

ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে
একজন ফ্রিডাম ফাইটার
তিন চার দিন হলো,
দেখা হলো
কার্নিভালমুখো যুদ্ধ পলাতক
একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে, সাথে তার
নতুন প্রেমিকা,
আবার একদিন
দেখা হলো একদল চকচকে তরুণ
টেনিস র‍্যাকেট হাতে
নামছে গাড়ি থেকে,
আরেকদিন
দেখলাম একটা শাদা চকচকে মাছ
প্রাচীন মসজিদের মতো বয়োবৃদ্ধের
বড়শীতে গাঁথা পদ্মপুকুরে
লাফাচ্ছে কী রাঙা আহ্লাদে
ঘর-ফেরা সন্ধ্যায়
দেখলাম আইখম্যানের মতো মুখ ক'রে
একজন ইমাম দাঁড়িয়েছেন মিনারের
উঁচু মাইক্রোফোনে
এবং চতুর্দিকে
নক্ষত্রের মতো নিষ্পাপ ক্লাবগুলো
কেবল ঝকঝক
চকচক করছে
অ-ন-ব-র-ত ।

যুদ্ধোত্তর রবিবার

এয়ারগান ঝুলিয়ে কাঁধে কুচকাওয়াজের মনোরম ভঙ্গীতে
দুপুর বেলাকে যেন নিষ্প্রদীপ মহড়ার নিরালোক দিয়ে ঘিরে
ছেলেরা খেলছে রবিবারে ; সুপুষ্ট শব্জীর মতো তাদের
সতেজ শরীর থেকে ছলকে পড়ছে কৈশোর, মাঠে, ঘাসে,
গাছ থেকে পালাচ্ছে পাখিরা ! কণ্ঠের অন্ধকার থেকে
উড়ে গেলো কয়েক স্কোয়াড্রন মিগ–১৭'র ঝাঁক । আর
আমাদের বধির করে মেশিনগান গর্জন করছে বারবার,
এক রত্তি ছোট্ট একটা চাবিঅলা দম–দেয়া ধূসরাভ ট্যাংক
একটা চারাগাছের চতুর্দিকে ঘুরপাক খেতে–খেতে
মাড়িয়ে দিলো কয়েকটা ফড়িং, পিঁপড়ে আর
অসংখ্য ঝংকারে ভরা তিনটে নীল ঝিঁঝির শরীর।

একটা আহত কাক
এয়ারগানের কালো ছররায় ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে
ছেলেদের আয়ত গভীর দৃষ্টির আড়ালে
ধুতুরার কাঁটা–ভরা ঝোপের নিরাপদে
পালিয়ে যেতে চাইলে

তখন তারা এক মনোরম উৎসাহে
বন্দুকের নলের সঙ্গে রঙিন সুতোর সখ্যতায় কাঠের সঙ্গীন
বেঁধে দাঁড়ালো কাতারবন্দী হয়ে
চকচকে নক্ষত্রোজ্জ্বল চোখে।

নীল নাবিকের পোশাক–পরা
একটি দীর্ঘদেহী বালক
দস্যু–জাহাজের কাপ্তানের মতো
কার্তুজ–ভরা কণ্ঠস্বরে
হাতের খেলনা পিস্তল উঁচিয়ে

যখন নির্দেশ দিলো
অন্তঃসত্ত্বা কামানের মতো স্বাস্থ্যবান সারিবদ্ধ ছেলেদের —
গোলাপ এবং চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ
আক্রান্ত হলো একের পর এক, যেন তারা শত্রুব্যূহ,
জটিল দুর্গের সারি
কিম্বা বিধর্মীর নৈশ-আস্তানা।

তারপর সোল্লাসে লাফ দিয়ে তারা
পার হলো বার্বড-ওয়্যার ধুতুরার,
দুর্যোগে ট্রানজিস্টারের কাঁটার মতো
কাৎরে উঠলো সেই কাক
এবং কাঠের সুনীল বেয়োনেটে ছত্রভঙ্গ
বিব্রত অস্তিত্ব তার ছড়িয়ে গেলো বাগানের চতুর্দিকে
যেন ফালি-ফালি ছেঁড়া কালো-পতাকা।

আর তক্ষুনি দঙ্গলের সবচেয়ে কম বয়সী
ছেলেটা
রাডারের মতো বিপদ-সঙ্কেত ভরা
গাছের নিস্পন্দ
ছায়ায়
ওঁয়া-ওঁয়া-ক'রে বাজিয়ে দিলো খাঁটি নিপুণ সাইরেন।

গোধূলি

আমি যখন তোমার দিকে দিলাম ছুঁড়ে গোধূলি
তখনো জানি দেয়াল খানি দাঁড়িয়ে থাকে শাদা
রাত-বিরেতে আকাশ তবু ঝরায় সিকি আধুলি
হাত বাড়িয়ে ধরবো নাকি বুকে আমার বাধা !

টাকাগুলো কবে পাবো ?

"The world owes me a million dollars"

— Gregory Corso

টাকাগুলো কবে পাবো ? সামনের শীতে ?
আসন্ন গ্রীষ্মে নয় ?
তবে আর কবে ! বৈশাখের ঝড়ের মতো
বিরূপ বাতাসে ঝরে পড়ছে অঝোরে
মণি মাণিক্যের মতো মূল্যবান চুলগুলো আমার এদিকে —
ওদিকে ! এখনই মনি-অর্ডার না যদি পাঠাও হে সময়,
হে কাল, হে শিল্প,
তবে
কবে ? আর কবে ?
যখন পড়বে দাঁত, নড়বে দেহের ভিৎ ?

দ্যাখো, দ্যাখো, মেঘের তালি-মারা নীল শার্ট প'রে
ফ্রিজিডেয়ার অথবা কোনো রেকর্ড প্লেয়ার ছাড়া
খামোকা হুল্লোড় করতে করতে যারা পৌঁছে যায়
দারুণ কার্পেটহীনভাবে কবিতার সোনালি তোরণে
সেই সব হা-ঘরে, উপোসী ও উল্লুকদের ভীড়ে
মিশে গিয়ে
আমিও হাসছি খুব বিশ্ববিজয়ীর মতো মুখ করে !
আমাকে দেখলে মনে হবে —
গোপন আয়ের ব্যবস্থা ঠিকই আছে।
— আছেই তো। অস্বীকার কখনো করেছি আমি
হে কাল, হে শিল্প ?
ওরা জানে না এবং কোনোদিন জানবে না —

পার্কের নিঃসঙ্গ বেঞ্চ,
রাতের টেবিল আর রজনীগন্ধার মতো কিছু শুভ্র সিগারেট ছাড়া

কেউ কোনোদিন জানবে না — ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক এক
আমারও রয়েছে ! 'রবীন্দ্র রচনাবলী' নামক বিশাল
বাণিজ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ আমিও রেখেছি।

তাছাড়া জীবনানন্দ দাশ এবং সুধীন্দ্রনাথসহ
ওসামু দাজাই
আমাকে টাকা পয়সা নিয়মিতভাবে এখনও পাঠান
বলতে পারো এ ব্যবসা বিশ্বব্যাপী —
একবার শার্ল বোদলেয়ার প্রেরিত এক পিপে সুরা আমি
পেয়েছিলাম কৈশোরে পা রেখে,
রিঙ্কে পাঠিয়েছিলেন কিছু শিল্পিত গোলাপ
(একজন প্রেমিকের কাছে আমি বিক্রি করেছি নির্ভয়ে)
এজরা পাউণ্ড দিয়েছিলেন অনেক ডলার
রাশি রাশি থলে ভরা অসংখ্য ডলার
(ডলার দিয়ে কিনেছি রাতের আকাশ)
এবং একটি গ্রীক মুদ্রা
(সে গ্রীক মুদ্রাটি সেই রাতের আকাশে নিয়মিত জ্বলজ্বল করে)

অতএব কপর্দক-শূন্য আমি, কোনো পুণ্য নেই
আমার বিব্রত অস্তিত্বের কাছে
কেউ নয় ঋণী— এমন দারুণ কথা
কি করে যে বলি ! যেদিকে তাকাই
পার্কে, পেভমেন্টে, আঁধারে, রাস্তায়
রেস্তোরাঁয়, ছড়ানো ছিটানো
প্রোজ্জ্বল কবিতাগুলো চতুর্দিক থেকে উঠে এসে
দুটো নিরপরাধ নরম বই হয়ে ইতিমধ্যে
তোমাদের নোংরা অঙ্গুলির নীচে চলে গেলো,
এই কি যথেষ্ট নয় ? এতেই কি লক্ষ লক্ষ টাকা
লেখা হলো না আমার নামে, পাওনা হলো না ?
হে সময়, হে কাল, হে শিল্প, হে বান্ধববৃন্দ,
টাকাগুলো কবে পাবো, কবে, কবে, কবে ?

একুশের স্বীকারোক্তি

যখন শত্রুকে গাল-মন্দ পাড়ি,
কিম্বা অযথা চেঁচাই,
আহ্লাদে লাফিয়ে উঠে
বিছানায় গড়াই ; মধ্য-রাতে তেরাস্তায় দাঁড়িয়ে
সম্মিলিত কণ্ঠে চীৎকারে দিনে দিনে জমে ওঠা উষ্মাকে
অশুভ পেঁচক ভেবে উদ্বিগ্ন গৃহস্থের মতো
সখেদে তাড়াই আর সাঁতার কাটতে গিয়ে
সখের প্রতিযোগিতায় নেমে মাঝ-নদীতে হঠাৎ
শবে-বরাতের শস্তা হাউই-এর মতো দম খরচ হ'য়ে গেলে
উপকূলবাসীদের সাহায্যের আশায়
যখনই প্রাণপণে ডাকি,
অথবা বক্তৃতামঞ্চে (কদাচ সুযোগ পেলে) অমৃত ভাষণে
জনতাকে সংযত রেখে অনভ্যস্ত জিহ্বা আমার
নিষ্ঠীবনের ফোয়ারা ছোটায়
অথবা কখনো-সখনো রঙ্গমঞ্চের বাতি নিভে গেলে
আঁধারের আড়াল থেকে যেসব অশ্লীল শব্দ ছুঁড়ে মারি,
এবং উজ্জ্বলমুখো বন্ধুদের ম্লান করে দেয়ার মতো কোনো
নিদারুণ দুঃসংবাদ জানিয়ে
সশব্দে গান ধরি,
মিছিল প্রত্যাগত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাসাই,
উর্ধ্বশ্বাস ট্যাক্সির মুখে ছিটকে-পড়া
দিকভ্রান্ত গ্রাম্যজনের চকিত, উদ্বেল মুখ দেখে
টিটকারিতে ফেটে পড়ি

অর্থাৎ যখনই চীৎকার করি
দেখি, আমারই কণ্ঠ থেকে
অনবরত
ঝ'রে পড়ছে অ, আ, ক, খ

যদিও আজীবন আমি অচেনা ঝোড়ো সমুদ্রে
নীল পোষাক পরা নাবিক হ'তে চেয়ে
আপাদমস্তক মুড়ে শার্ট-পাৎলুনে
দিনের পর দিন
ঘুরেছি পরিচিত শহরের আশপাশে,
স্বদেশের বিহ্বল জনস্রোতে

অথচ নিশ্চিত জানি
আমার আবাল্য-চেনা ভূগোলের পরপারে
অন্য সব সমৃদ্ধতর শহর রয়েছে,
রয়েছে অজানা লাবণ্যভরা তৃণের বিস্তার
উপত্যকার উজ্জ্বল আভাস,
বিদেশের ফুটপাথে বর্ণোজ্জ্বল দোকানের বৈভব,
মধ্যরাত পেরুনো আলো-জ্বলা কাফের জটলা,
সান্টাক্রুজের মতো এভিনিউর দু'ধারে
তুষারমোড়া শাদা-বৃক্ষের সারি
নিত্য নতুন ছাঁদের জামা-জুতো,
রেস্তোরাঁর কাঁচের ওপারে ব'সে থাকা বেদনার স্ফূরিত অধর
আর মানুষের বাসনার মতো ঊর্ধ্বগামী
স্কাইস্ক্রেপারের কাতার —
কিন্তু তবু
চুরুট ধরিয়ে মুখে
তিন বোতামের চেক-কাটা ব্রাউনরঙা সুট প'রে,
বাতাসে উড়িয়ে টাই
ব্রিফকেস হাতে 'গুডবাই' বলে দাঁড়াবো না
টিকিট কেনার কাউন্টারে কোনোদিন —
ভুলেও যাবো না আমি এয়ারপোর্টের দিকে
দৌড়ুতে-দৌড়ুতে, জানি, ধরবো না
মেঘ-ছোঁয়া ভিন্নদেশগামী কোনো প্লেন।

একবার দূর বাল্যকালে

একবার পেয়েছিলাম দূর বাল্যকালে, কৈশোরে
রাস্তার ফাটলে কিছু তরল জ্যোৎস্না —
সেই থেকে সমস্ত যৌবন অবধি, এমন কি গত যুদ্ধে,
ব্ল্যাক-আউটের ট্রেঞ্চেও, সন্ত্রস্ত স্মৃতির ভেতরে ছিলো
আসমুদ্রহিমাচল জুড়ে জ্যোৎস্নার জান্তব জাগরণ . . .

শুনেছি জ্যোৎস্না শুধু ধ্যানমৌন পাহাড়ের চূড়ায় কোনো
ত্রিশূলদেহ একাকী দরবেশ কিম্বা হিমালয়ের পাদদেশে,
তরাই জঙ্গলের অন্ধকারে, ডোরাকাটা বাঘের হলুদ শরীর নয়,
বরং ঘরের ছাদ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে পোষমানা পায়রা তখন ওড়ে,
তখনও জন্মায় জ্যোৎস্না : ঝ'রে পড়ে গৃহস্থের সরল উদ্যানে।

ভাঙা গলায়, শীত রাত্রে 'জ্যোৎস্না জ্যোৎস্না' ব'লে বারান্দায় দাঁড়ালে
হুইসিল বাজিয়ে দৌড়ে আসবে পুলিশ, গর্জাবে খাকি জিপ !
অথচ বদান্যতার অভাব নেই কোনো, জ্যোৎস্নার জ্বলজ্বলে লাবণ্য
আজীবন খুচরো পয়সার মতো পার্কে, ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প'ড়ে থাকে।
শুধু যথার্থ হা-ঘরে যারা, বেকার, উপোসী,
তারাই তাকে নির্বিকার, নোংরা আঙুলে, বারবার খুঁজে পায় —

জতুগৃহ

এক সময় ইচ্ছে ছিলো অনেক কিছু কেনাকাটার
রঙিন জামা, নতুন জুতো
নানান রঙের ফিয়াট গাড়ি, বাগানঅলা হলুদ বাড়ি
রেডিওগ্রাম, টেলিভিশন
চট্টগ্রামে সবুজ টিলা, ইচ্ছে ছিলো কিনেই রাখি
মস্ত একটা জমিদারী
ইচ্ছে ছিলো অনেক কিছু —
ক্যাবিয়ানা কাটিয়ে দিয়ে
ফটকা খেলি, একলা ঘরে মট্‌কা মেরে
তোমার কথা ভেবেই মরি
রোজ সকালে রোজ বিকেলে দু'বার ক'রে স্নান ঘরে যাই
দু'বার ক'রে দাড়ি কামাই, দাঁতও মাজি, ইচ্ছে ছিলো
স্বদেশটাকে নতুন ক'রে ভেঙেচুরে খুব সহজ আর
সরল করি, ইচ্ছে ছিলো . . .
তাইতো আমি ক্রমে ক্রমেই ফেস্টুনের নানান লেখা
পড়বো ব'লে দুপুরবেলা একা একাই
অনুসরণ করেছিলাম শ্লোগান দেয়া মিছিলগুলো
— আমাকে খুব মোহন স্বরে ডেকেছিলো !

স্বীকার করি, স্বীকার করি
ভালোবাসার জন্যে আমি শহরভরা প্ল্যাকার্ডগুলো
দারুণ যত্নে পড়েছিলাম, অন্ধকারে, একলা রাতে
পিস্তলের সে ঠাণ্ডা বাঁটের ধাতব কঠিন
শিউরানি সব পেয়েছিল এই করতল,
তোমার উষ্ণ স্তনের কাছে
নিরাপদে যাবেই ব'লে
বিপ্লবীদের আত্মচরিত ঘেঁটেছিলো রাত্রি জেগে
আমার ব্যর্থ আঙুলগুলো।

তীক্ষ্ণ কোমল, করুণ রঙিন
ব্যক্তিগত বিস্ফোরণের রাজনীতিতে নেমেছিলাম
বাগানঅলা একটা হলুদ নতুন বাড়ি কিনবো ব'লে।
এখন আমি সেই বাড়িটা (রঙিন জামা জুতো সুদ্ধো)
উড়িয়ে দিতে পারলে যেন খুব বেঁচে যাই ।

তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো যাতে সেনাবাহিনী
গোলাপের গুচ্ছ কাঁধে নিয়ে
মার্চপাস্ট ক'রে চ'লে যাবে
এবং স্যাল্যুট করবে
কেবল তোমাকে প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
বন-বাদাড় ডিঙিয়ে
কাঁটা-তার, ব্যারিকেড পার হ'য়ে, অনেক রণাঙ্গনের স্মৃতি নিয়ে
আর্মার্ড-কারগুলো এসে দাঁড়াবে
ভায়োলিন বোঝাই ক'রে
কেবল তোমার দোরগোড়ায় প্রিয়তমা।

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো —
এমন ব্যবস্থা করবো
বি-৫২ আর মিগ-২১গুলো
মাথার ওপর গোঁ-গোঁ করবে
ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
চকোলেট, টফি আর লজেন্সগুলো
প্যারাট্রুপারদের মতো ঝ'রে পড়বে
কেবল তোমার উঠোনে প্রিয়তমা।

ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই . . . আমি এমন ব্যবস্থা করবো
একজন কবি কমাণ্ড করবেন বঙ্গোপসাগরের সবগুলো রণতরী
এবং আসন্ন নির্বাচনে সমরমন্ত্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়
সবগুলো গণভোট পাবেন একজন প্রেমিক, প্রিয়তমা !

সংঘর্ষের সব সম্ভাবনা, ঠিক জেনো, শেষ হ'য়ে যাবে —
আমি এমন ব্যবস্থা করবো, একজন গায়ক
অনায়াসে বিরোধী দলের অধিনায়ক হ'য়ে যাবেন
সীমান্তের ট্রেঞ্চগুলোয় পাহারা দেবে সারাটা বৎসর
লাল নীল সোনালি মাছ —
ভালোবাসার চোরাচালান ছাড়া সবকিছু নিষিদ্ধ হ'য়ে যাবে, প্রিয়তমা।

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো মুদ্রাস্ফীতি কমে গিয়ে বেড়ে যাবে
শিল্পোত্তীর্ণ কবিতার সংখ্যা প্রতিদিন
আমি এমন ব্যবস্থা করবো গণরোষের বদলে
গণচুম্বনের ভয়ে
হন্তারকের হাত থেকে প'ড়ে যাবে ছুরি, প্রিয়তমা।

ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
শীতের পার্কের ওপর বসন্তের সংগোপন আক্রমণের মতো
অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে-বাজাতে বিপ্লবীরা দাঁড়াবে শহরে,

ভয় নেই, আমি এমন ব্যবস্থা করবো
স্টেটব্যাঙ্কে গিয়ে
গোলাপ কিম্বা চন্দ্রমল্লিকা ভাঙালে অন্তত চার লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে
একটি বেলফুল দিলে চারটি কার্ডিগান।
ভয় নেই, ভয় নেই
ভয় নেই
আমি এমন ব্যবস্থা করবো
নৌ, বিমান আর পদাতিক বাহিনী
কেবল তোমাকেই চতুর্দিক থেকে ঘিরে-ঘিরে
নিশিদিন অভিবাদন করবে, প্রিয়তমা।

কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই

উৎসর্গ

আদনান কাদরী

প্রকাশকাল : ১৯৭৮

আজ সারাদিন

বাতাস আমাকে লম্বা হাত বাড়িয়ে
চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঘুরে বেড়িয়েছে আজ সারাদিন
কয়েকটা লতাপাতা নিয়ে
বিদঘুটে বাতাস,
হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে আমাকে,
লাল পাগড়ি-পরা পুলিশের মতো কৃষ্ণচূড়া
হেঁকে বললো :
'তুমি বন্দী' !

আজ সকাল থেকে একজোড়া শালিক
গোয়েন্দার মতো আমার
পেছনে পেছনে ঘুরছে
যেন এভিনিউ পার হ'য়ে নির্জন সড়কে
পা রাখলেই আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবে ঠিক !

'তুমি অপরাধী'
— এই কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যেন
ব'লে গেল বজ্রসহ এক পশলা হঠাৎ বৃষ্টিপাত —
'তুমি অপরাধী —
মানুষের মুখের আদলে গড়া একটি গোলাপের কাছে।'

বৃষ্টিভেজা একটি কালো কাক
একটা কম্পমান আধ-ভাঙা ডালের ওপর থেকে
কিছুটা কাতর আর কিছুটা কর্কশ গলায়
আবার ব'লে উঠলো : তু মি অ প রা ধী !

আজ সারাদিন বাতাস, বৃষ্টি আর শালিক
আমাকে ধাওয়া ক'রে বেড়ালো

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত
তোমার বাড়ির
কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গেলাম
কিন্তু সেখানে ঘাটের ওপর এক প্রাচীন বুড়ি
সোনার ছাই দিয়ে ঘটি-বাটি মেজে চলেছে আপন মনে।
একটা সাংঘাতিক সূক্ষ্ম ধ্বনি শুয়ে আছে
পিরিচে, পেয়ালায়।

ঐ বাজনা শুনতে নেই
ঐ বাজনা নৌকোর পাল খুলে নেয়
ঐ বাজনা স্টীমারকে ডাঙার ওপর আছড়ে ফ্যালে
ঐ বাজনা গ্রাস করে প্রেম, স্মৃতি, শস্য, শয্যা ও গৃহ

তোমার বাড়ির
কিন্নরকণ্ঠ নদী অবধি আমি গিয়েছিলাম।
কিন্তু হাতভর্তি শালিকের পালক
আর চুলের মধ্যে এলোপাতাড়ি বৃষ্টির ছাঁট নিয়ে
উল্টোপাল্টা পা ফেলে
তোমার দরোজা পর্যন্ত যেতে ইচ্ছে হলো না।

ঐ শালিকের ভেতর উনুনের আভা, মশলার ঘ্রাণ।
তোমার চিবুক, রুটি আর লালচে চুলের গন্ধ,
ঐ বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে পাতা আছে তোমার
বারান্দার চেয়ারগুলো
তাহলে তোমার কাছে গিয়ে আর কি হবে।

আজ সারাদিন একজোড়া শালিক
গোয়েন্দা পুলিশের মতো
বাতাস একটা বুনো একরোখা মোষের মতো
আমাকে ধাওয়া করে বেড়ালো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত

আমি অনেকদিন পর একজন হা-ঘরে
উদ্বাস্তু হ'য়ে চরকির মতো গোটা শহর ঘুরে বেড়ালাম।

কেন যেতে চাই

আমি তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
ঝক্‌ঝকে নতুন একটি সেতু
যেমন নদীর পাড়ে দাঁড়ানো ঐ লোকগুলোর কাছে পৌঁছে যেতে চায়
কিন্তু তামা ও পিতলসহ বাসন-কোসন, চিঁড়ে-গুড় ইত্যাদি গোছাতে
তোমরা ব্যস্ত, বড্‌ড বেশি ব্যস্ত।

মাঝে মাঝে দূর থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তোমাদের ব্যস্ততা দেখতে
ভালোবাসি।

সমুদ্র তরঙ্গগুলো সমুদ্রকে নিয়ে এ্যাতো ব্যস্ত নয়,
অরণ্যের অভ্যন্তরে ক্ষুধার্ত, স্বাধীন বাঘ হরিণের জন্য এ্যাতো
ব্যস্ত নয়,
দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রেমিকের হাত ব্রেসিয়ারের ভেতর এ্যাতো
ব্যস্ত নয়,

আমি তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
শীতের পর প্রথম উল্টোপাল্টা বাতাস যেমন
প্রত্যেকটি ফাঁক-ফোকর এবং রন্ধ্র দিয়ে যেতে চায় তোমাদের
চোখে-মুখে-চুলে
কিন্তু তৈজসপত্রের রঙ, টেবিল ও চেয়ারের ঢঙ, জানালার পর্দা
ইত্যাদি
বদলাতে, গোছগাছ করতে
তোমরা ব্যস্ত, বড্‌ড বেশি ব্যস্ত।

ক্বচিৎ-কখনো খুব কাছ থেকে তোমাদের প্রচণ্ড ব্যস্ততা আমি দেখি,
দিগন্ত আঁধার-করা সজল শ্রাবণও বৃষ্টি ঝরানোর জন্য
অমন ব্যস্ত নয়,

তাক-করা রাইফেলের অমোঘ রেঞ্জ থেকে উড়ে পালানোর জন্য
হরিয়ালের ঝাঁকও অমন ব্যস্ত নয়,
কর্কট-রোগীর দেহে ক্যান্সারের কোষগুলো ছড়িয়ে পড়ার জন্য
অমন ব্যস্ত নয়,

আমি তো তোমাদেরই দিকে যেতে চাই
ইন্দ্রনীল একটি মোহন আংটি
প্রেমিকের কম্পমান হাত থেকে প্রেমিকার আঙুলে যেমন
উঠে যেতে চায়,
কিন্তু চাষাবাদ, বাণিজ্য এবং প্রতিযোগিতামূলক শিল্প
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে
তোমরা ব্যস্ত, বড্ড বেশি ব্যস্ত।

হরিণ-হননকামী ব্যাধের মাংসল মুঠো থেকে ছুটে-যাওয়া
বল্লমের মতো তোমরা ব্যস্ত
দিগভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত পথিককে গিলে ফেলার জন্য উত্তর বাংলার
চোরাবালির মতো তোমরা ব্যস্ত
চিরচেনা বৃক্ষরাজিকে পল্লবশূন্য করার জন্য শীতের জটিল
বিস্তারের মতো তোমরা ব্যস্ত
যাত্রী নিয়ে ঘর-ফেরা নৌকোগুলো হরণ করার জন্য চোরাস্রোত
এবং ঘূর্ণিপাকের মতো তোমরা ব্যস্ত

তোমরা ব্যস্ত, তোমরা ব্যস্ত, তোমরা ব্যস্ত,
তোমরা বড্ড বেশি ব্যস্ত
অথচ আমি তো আজীবন তোমাদেরই দিকে যেতে চাই।
কেন যেতে চাই ।

প্রেম

We must love one another or die. — W. H. Auden

না, প্রেম সে কোনো ছিপছিপে নৌকো নয় —
যার চোখ, মুখ, নাক ঠুকরে খাবে
তলোয়ার-মাছের দঙ্গল, সুগভীর জলের জঙ্গলে
সমুদ্রচারীর বাঁকা দাঁতের জন্যে যে উঠছে বেড়ে,
তাকে, হ্যাঁ, তাকে কেবল জিজ্ঞেস ক'রো, সেই বলবে
না, প্রেম সে কোনো ছিপছিপে নৌকো নয়,
ভেঙে-আসা জাহাজের পাটাতন নয়, দারুচিনি দ্বীপ নয়,
দীপ্র বাহুর সাঁতার নয় ; খড়কুটো ? তা-ও নয়।
ঝোড়া রাতে পুরোনো আটচালার কিংবা প্রবল বৃষ্টিতে
কোনো এক গাড়ি বারান্দার ছাঁট-লাগা আশ্রয়টুকুও নয়।
ফুসফুসের ভেতর যদি পোকা-মাকড় গুঞ্জন ক'রে ওঠে
না, প্রেম তখন আর শুশ্রূষাও নয় ; সর্বদা, সর্বত্র
পরাস্ত সে ; মৃত প্রেমিকের ঠাণ্ডা হাত ধ'রে
সে বড়ো বিহ্বল, হাঁটু ভেঙে-পড়া কাতর মানুষ।
মাথার খুলির মধ্যে যখন গভীর গূঢ় বেদনার
চোরাস্রোত হীরকের ধারালো-ছটার মতো
ব'য়ে যায়, বড়ো তাৎপর্যহীন হ'য়ে ওঠে আমাদের
উরুর উত্থান, উদ্যত শিশ্নের লাফ, স্তনের গঠন।

মাঝে মাঝে মনে হয় শীতরাতে শুধু কম্বলের জন্যে,
দুটো চাপাতি এবং সামান্য শব্জীর জন্যে
কিংবা একটু শান্তির আকাঙ্ক্ষায়, কেবল স্বস্তির জন্যে
বেদনার অবসান চেয়ে তোমাকে হয়তো কিছু বর্বরের কাছে
অনায়াসে বিক্রি ক'রে দিতে পারি — অবশ্যই পারি।
কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, এই স্বীকারোক্তির পর মনে হলো :
হয়তো বা আমি তা পারি না — হয়তো আমি তা পারবো না।

'সঙ্গতি'

(অমিয় চক্রবর্তী, শ্রদ্ধাস্পদেষু)

বন্য শূকর খুঁজে পাবে প্রিয় কাদা
মাছরাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ,
কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে শাদা
ঘন জঙ্গলে ময়ূর দেখাবে নাচ

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক–ই
কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না ...

একাকী পথিক ফিরে যাবে তার ঘরে
শূন্য হাঁড়ির গহ্বরে অবিরত
শাদা ভাত ঠিক উঠবেই ফুটে তারাপুঞ্জের মতো,
পুরোনো গানের বিস্মৃত–কথা ফিরবে তোমার স্বরে

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক–ই
কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না ...

ব্যারাকে–ব্যারাকে থামবে কুচকাওয়াজ
ক্ষুধার্ত বাঘ পেয়ে যাবে নীলগাই,
গ্রামান্তরের বাতাস আনবে স্বাদু আওয়াজ
মেয়েলি গানের— তোমরা দু'জন একঘরে পাবে ঠাঁই

প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক–ই
কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না ...

একটা মরা শালিক

(আবদুল মান্নান সৈয়দ–কে)

একটা মরা শালিক দেখে এই উত্তেজনার কথা আমার তো নয়।
বন্ধুদের মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্যে আমি উদাসীনভাবে হেঁটে
গেছি মর্গে, বহুবার,
পলেস্তরা খসে–পড়া দেয়ালের সঙ্গে চোখ বাঁধা প্রিয়জনকে দেখেছি
স্টেনগানে পরিবৃত ;
দেখেছি পিতাকে লাবণ্যের বাল্যকাল ছিঁড়ে
কবরখানার দিকে চলে যেতে, কৈশোরে মা'কেও ;
শক্ত ছুরিতে বেঁধা অসংখ্য মৃত্যু পার হ'য়ে
নিদারুণ এক পাকাপোক্ত মানুষের মতো
অথবা সেই সমর্থ বৃদ্ধের মতোন আত্মরক্ষাময় স্থবিরতায়
পৌঁছে গেছি নিরাপদে, যিনি পুত্র এবং আপন
পুত্রের পুত্রকে দেখেছেন
হঠাৎ ম'রে যেতে, দেখেছেন —
স্বাধীনতা, স্বজন হনন, ট্রেঞ্চ, কামানের ঝলমলে নল জ্যোৎস্নারাতে ;

অথচ ইতিহাসের একেকটি ভয়ঙ্কর বাঁকে দাঁড়িয়েও
তিনি ভোলেন নি কখনও নিশ্চিন্তে তাঁর
প্রিয় পানগুলো চিবুতে, এইতো সেদিনও তাঁকে দেখলাম
প্রতিবেশীদের শবযাত্রায় নিশ্চিত সঙ্গী হয়ে, একাকী আজিমপুর থেকে
বেরিয়ে এসেই কবরখানার গেটে — পানের দোকানে
'আরেকটু জর্দা দাও' বলে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর
লোলচর্ম, শিরা–ওঠা হাত !
আমারও চৈতন্য এই শিরা–ওঠা বৃদ্ধের হাতের মতো
সবকিছু দেখেছিল ছুঁয়ে — শিশুর কোমল ত্বক,
নধর ছাগল ছানা, নিস্তল নারী ও গোলাপের চারা,
অকালে নিঃস্পন্দ সব বন্ধুদের চোখ।

এখন তো উত্তর তিরিশ আমি, অল্প বয়সেই অর্থাৎ চব্বিশ
কিংবা পঁচিশের ঢের আগে, মায়ের মৃত্যুর পর
আমিও ভেবেছি : 'এবার অপার স্বাধীনতা, যদিও নেহাৎ ব্যক্তিগত,
তবুও, আর তো পরাধীন নই আমি' — অভিভাবকহীনতাকেই
সেদিন ভেবেছি স্বাধীনতা, এখনও ভাবি। এই যেমন ধরুন
একেক সময় একেকটি দেশে কেউ কেউ শিরস্ত্রাণের প্রভাবে
অত্যধিক অভিভাবক হয়ে ওঠেন বলেই মাঝে মাঝে এতো শোরগোল,
হৈহল্লা : 'সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র, গণতন্ত্র' ব'লে চীৎকার ! আদর্শবাদও
ছিল না আমার (আদর্শ কি অভিভাবক নয় ?)
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছি নটরাজের মতো,
নতজানু কখনো হই নি আমি গোলাপ অথবা রাঙা মেঘের স্বাস্থ্যের
কাছে,
কিংবা কোনো গম্ভীর শবযাত্রার কাছে,
তবুও কখনো–সখনো অভিভাবক এসেছে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের
মতো দ্রুতবেগে
মহিলার সোনালি চুল হ'য়ে জুঁই কিংবা চন্দ্রমল্লিকার ছদ্মবেশে।
তাদের অচির আধিপত্য মেনে নিয়েও
সব শোক, প্রেম, হতাশার পরপারে দাঁড়িয়ে
সেই বৃদ্ধের হাত আমার চৈতন্য থেকে উঠে এসে
কবরখানার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছে
' — আরেকটু জর্দা দাও।'
অভিজ্ঞ বৃদ্ধের প্রজ্ঞা অর্জন করেছি ভেবে
উপেক্ষার উঁচু দুর্গে
রাজাধিরাজের মতো বসেছিলাম স্থবির, নিঃস্পন্দ
স্নায়ুশাসিত হৃদয় নিয়ে — নর্তকীদের মোহন উরুর পরপারে।

অথচ আজ ভোরে নৈশকালীন বাতাস ও বৃষ্টির পর
দরোজা খুলেই দেখি — উঠোনের কিছু প্রগাঢ় সবুজ
লতাপাতার মধ্যে একটা হলুদ মরা শালিক কাৎ হয়ে পড়ে আছে
তারপর সারাদিন সেই মরা শালিকটা
ঘুরে বেড়ালো আমার সঙ্গে সঙ্গে
আশ্চর্য নাছোড়বান্দা — ঘর থেকে ঘরে। রেস্তোরাঁয়,
রাস্তায়, আড্ডায়, ফুটপাতে, সর্বত্র সে গেল
আমার কাঁধের ওপর সওয়ার হয়ে : এবং আমার
মনে এলো অনেকদিন আগের কথা — শীতের সকালে

ও রকম শালিক রঙা একটা হলুদ ওভারকোট প'রে
আমি ঘুরে বেড়াতাম চৌধুরীদের বাগানে,
কিন্তু তাতে কি ? একটা মরা শালিক
আমার ওপর এমন দারুণ আধিপত্য
বিস্তার করবে কেন ? এই বিবর্ণ হলুদ আমার অভিভাবক
হয়ে উঠবে কেন ? আমি তো মৃতের উল্টে যাওয়া চোখের শাদা
অসংখ্যবার দেখেছি ॥

বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলি

যেন দূর-পাল্লার কামান থেকে ছুটে যায় ভারি গোলা —
একটা লাফিয়ে-ওঠা বাঘ ঢুকে পড়ে গভীর জঙ্গলে,
টলে ওঠে শিকারীর বল্লমের মতো ছয় ফুট উঁচু ঘাস !

চারিদিকে বিপ্লবীর চোখের মতন উদ্ধত আগুন-রঙা-ফুল
গাছে-গাছে : অত্যন্ত উজ্জ্বল উঁচু ডালে ; জ্যোৎস্নায় ঝলমলে
অপ্সরার মতো লতাগুল্মে-জড়ানো এক মোহন হরিণীর সাথে

বন্য মোষের মতন সঙ্গম করছে শিং বাঁকানো একটি হরিণ,
সপরিবারে হাওয়া খাচ্ছে কয়েক দঙ্গল রাত-চরা পাখি,
কালো জলে শাদা পাগড়ি-পরা রাজা-বাদশার মতো

একটি সম্ভ্রান্ত রাজহাঁস ! এই দৃশ্য আমাকে কি দেবে ?
তোমাকে দেয় নি কিছু। ফিরে যাবো জ্যামিতিক রেস্তোরাঁয়,
নিজের টেবিলে ?
তবু থাক, দীর্ঘ আয়ু পাক হরিণের সঙ্গমখানি, রাজহাঁসটির
একাকী ভ্রমণ।

তুমি গান গাইলে

তুমি গান গাইলে,
লক্ষ লক্ষ কিলোয়াটের বাল্বের মতো
জুঁই, চামেলি চন্দ্রমল্লিকা জ্বলে উঠলো না

তুমি গান গাইলে,
ব্যারাকে-ব্যারাকে বিউগল্ বেজে উঠলো,
সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ থামলো না

তুমি গান গাইলে,
সাইরেন বাজিয়ে রেডক্রসের ভ্যান
শববাহকের মতো গম্ভীর মুখে
ত্রাণ-শিবিরের গেটে নিয়মিত আজও দাঁড়ালো

তুমি গান গাইলে,
পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় আরো একটি
রাষ্ট্র নিঃশব্দে জ্বলে উঠলো —
ক্যান্সারের প্রতিষেধক পাওয়া গেল না।

তুমি গান গাইলে,
কালো পণ্যে আমাদের দোকানপাট,
সকল ফুটপাত ছেয়ে গেল —
কালো টাকা ছাড়া এখন আর গোলাপও কেনা যায় না

তুমি গান গাইলে,
জাতিসংঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন ক'রে সারি সারি ট্যাঙ্ক
জলপাই পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে
খুব ভয়াবহভাবে যুদ্ধবিরতির সীমারেখা পার হ'লো

তুমি গান গাইলে,
আমাকে আজও হাসপাতালে
অনিদ্র আত্মীয়ের পরিচর্যায় চ'লে যেতে হ'লো নতমুখে।

তুমি গান গাইলে,
সুদূর চিলিতে তিনজন বিপ্লবী তরুণ
শূন্যচোখে এক বুড়ো জেনারেলের নির্দেশে
খুব শব্দহীনভাবে ইলেকট্রিক চেয়ারে ব'সে পড়লো

তুমি গান গাইলে,
কোথায় কোন গোপন কাউন্টারে কারা খুব নিচু স্বরে
জরুরি ওষুধগুলো বিক্রি করে দিল,
আমি তাদের দিশাও পেলাম না

তুমি গান গাইলে,
আমাদের উঠোনের প্রাচীন গাছ ছুঁয়ে
বিস্ফোরক-ভরা তিনটি বিমান উড়ে গেল

তুমি গান গাইলে,
সাঁকো পেরুতে গিয়ে সাহসীর মতো অসতর্ক পায়ে
তোমার প্রেমিক ট'লে প'ড়ে গেল জলে,
তোমার গান ছিপছিপে নৌকোর মতো
তার কাছে এখনও পৌঁছুলো না

প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে

অনেক দূর থেকে এসেছে এ গোলাপ
আমার করতলে

আগুনের আঁচে ঝলসে গেছে তার ডানা
বার্বড্-ওয়্যারের কাঁটায় ছিঁড়ে গেছে
কোমল মসৃণ পাপড়ি,
তাকে মাড়িয়ে গেছে সাঁজোয়া বাহিনী বহুবার,
ক্যাপটেন আর কর্নেলদের কালো চামড়ার
দীর্ঘ সব বুটের
আশেপাশে,
স্বাস্থ্যবান কামানের চকচকে নলের ছায়ায়

সে ছিল রক্তের গাঢ় লাল ছদ্মবেশ প'রে,
হন্তারক হাতের তালু থেকে গড়িয়ে পড়েছে বহুবার
ট্রেঞ্চের কাদায়, সৈনিকের
শাদা করোটিতে। অনেক দীর্ঘশ্বাস, জ্বলে-যাওয়া গ্রাম,
অনেক মৃত বালকের কলরোল সঙ্গে নিয়ে এসেছে এ গোলাপ
একে আমি কোথায় রাখি ? কোন হিরণ্ময় পাত্রে তাকে ঢাকি ?

মাথার ওপরে ক্রমাগত গর্জমান এ্যারোপ্লেন,
জেটিতে নড়ছে ক্রেন, চতুর্দিকে ভাসছে রণতরী
স্মৃতির ভেতরে ফের খুলে যাচ্ছে কোষবদ্ধ এক
নিপুণ তরবারি, চতুর্দিক থেকে যদি ট্রেন
সমরাস্ত্র নিয়ে আবার দাঁড়ায় এ-শহরে, যদি ফের
কুচকাওয়াজের শব্দে ভরে যায় আমার দিন আর রাত,
চেনাজানা সকল ফুটপাত, তখন লুকাবো তাকে
কোন গঞ্জে ? কোন নদীর বাঁকে ? কোন অজ-পাড়াগাঁয়,
কাদের গোপন ছাউনিতে ?
অনেক রক্ত আগুন পার হয়ে এসেছে এ-গোলাপ
আমার বিব্রত করতলে, প্রত্যহের কালো রণাঙ্গনে।

কেন যেন বলছে

ক্যাপটেন, তুমি বসে আছো নদীর কাছে,
জ্যোৎস্না ঝলমল করছে তোমার
কাঁধের তিন তারায়, পায়ের পাতা
জলের মধ্যে ডুবে আছে

ক্যাপটেন, আজ রাত্রে মহিলার মতো নম্র হয়েছো তুমি,
তিন ফুট দূরে তোমার কালো চকচকে বুট,
অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক তুমি, তোমার হাতে
একটা নিহত পাখির ছানা স্তব্ধ হয়ে আছে,

ক্যাপটেন, তোমার কালো চকচকে বুটের ভেতর
এতক্ষণে কয়েক ইঞ্চি শিশির জমেছে,
সর্বত্রগামী জ্যোৎস্না কুণ্ডলী পাকিয়ে
শুয়ে আছে বুটের গহ্বরে,

ক্যাপটেন, তোমাকে ত্যাগ করে দূরে পড়ে আছে
তোমার বিফুল স্টেনগান, তার চৌদিকে ঘাস-পোকার গুঞ্জন
শেষ ফাল্গুনের বাতাস তোমার ইউনিফর্মে,
চতুর্দিকে ছড়ানো বুলেটের খোলসগুলো শিশিরে ভিজে গেছে,

ক্যাপটেন, ঋতুরাজ পালাবে শিগগির
নদীর ধারে পানির মধ্যে তোমার পায়ের পাতা,
অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক বসে আছো

ক্যাপটেন, টুপটাপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে তোমার চারদিকে
শিশির, জ্যোৎস্না, টগর, চাঁপা আর বকুল
একটা দুর্যোগ পেরিয়েছো, সামনে আরেকটা

ক্যাপটেন, এবার তুমি চীৎকার করে ব'লে ওঠো 'হ্যাণ্ডস আপ'
টলে-পড়া গোলাপ দাঁড়িয়ে পড়ুক তার ঝাড়ে,
হন্তারকের হাত থেকে পড়ে যাক ছুরি,
পলায়নপটু ঋতুরাজ দাঁড়াক দু'হাত তুলে
পুষ্পের সম্ভার নিয়ে পার্কে, পুকুর পাড়ে গরীবের
পাড়াগাঁয়ে

ক্যাপটেন, 'হ্যাণ্ডস আপ' 'হ্যাণ্ডস আপ', 'হ্যাণ্ডস আপ'
আরো একবার ব'লে ওঠো শিশির-সিক্ত চোখে,
এই জ্যোৎস্নায় একাকী দাঁড়িয়ে।

আমি নই

আমি নই কারো নিতম্বশোভা, বৈঠকখানা, চেয়ার,
আসবাব নই দামী,
করতলগত পাথরখণ্ড ছুঁড়ে দিলে কানা পুকুরে
উবু হ'য়ে পড়ে থাকবোই আমি ভালো মানুষের মতো ?

তোমার চোখের সূর্যাস্ত কি আমার দিনাবসান ।

দিবস-রজনী পাগল বাতাস অন্য গল্প বলে :
আঁস্তাকুড়ের শুকনো কাগজে, জাহাজের মাস্তুলে
আরেক রকম সুস্থির এক বাতাস রয়েছে লেগে।
হরিণ যেমন স্থবির জলের কাছে,
তেমনি আমার চকিত দাঁড়িয়ে থাকা
তার মানে, জেনো, নুলো-ঠুঁটোদের মতো
ঝরা পাতাদের ইয়ার-দোস্ত্ নই আমি —
বৃক্ষলতার শান্ত, শীতল অনুজ,
পথে-পথে ফেলে যাবো না বৃষ্টিধারা,
মেঘে-মেঘে বেলা হবে না ছায়াচ্ছন্ন ।

ঝরাপাতা নই, মরা পাতা নই
টিলা নই আমি লাল প্রান্তরে উত্তর বাংলার,
সান্ধ্যভ্রমণে সঙ্গীও নই ঘাট নই নদীকূলে,
আমার মধ্যে পান্থশালার আরামটুকুও পেলে না।
তবুও তোমার পরিত্যক্ত কৌটোর মতো আমি
হেলায়-ফেলায় ঢের দিন প'ড়ে আছি,
এবার না হয় অন্যরকম লাবণ্যহীন হাওয়ায়
মাস্তুল তুলে ভেসে যাই, ভেঙে পড়ি,
কিংবা ময়লা শুকনো কাগজ
— পাখির ছানার মতো —
উড়ে গিয়ে সোজা ঘুরে প'ড়ে যাই
আঁস্তাকুড়ের মধ্যে
অন্যরকম, অন্যরকম, অন্যরকম হাওয়ায় ॥

অটোগ্রাফ দেয়ার আগে

নিজের নাম সে তো লিখেছি বহুবার —
কলকাতায় বোটানিকাল গার্ডেনে, রাধাচূড়া গাছের বাকলে
ছুরির ধারালো কোনো সুতীক্ষ্ণ ফলায়,
একবার অন্য একদল কিশোরের অটোগ্রাফের খাতায়,
দিল্লীতে বেড়াতে গিয়ে কুতুব মিনারে
(কোনারকে এখনও যাই নি। গেলে, দ্বিধাহীন জানি আমি
মন্দিরের গায়ে
উৎকীর্ণ কিন্নরীদের স্তন কিংবা বাহু পড়তো না বাদ কোনমতে)
বহুবার লিখেছি তো এই নাম
আমার বিফুল ফলপ্রসূহীন নাম : ৪৪/এ, দিলকুশা স্ট্রীটের বিষণ্ন
একটি চিলেকোঠায়, ফেলে আসা শহরের পরাস্ত পাঁচিলে,
কাঞ্চনজংঘা হে ! দার্জিলিঙে, তোমারও জানুতে ! সমুদ্রে যাই নি,
নইলে দেখতাম আমার নামের সঙ্গে লিখে রেখে
অন্য এক পরাক্রান্ত নাম
সোনালি নরম বালিয়াড়ি থেকে কেমন উজ্জ্বল আহ্লাদে ছোঁ মেরে
চলে যাচ্ছে বাজপাখির মতো ধূসর এক তরঙ্গের দল,
নাকি শুধু আমার নামের মরা পায়রাটা মুখে নিয়ে
সমুদ্র পালিয়ে যেতো গুটিশুটি কালো এক বেড়ালের মতো —

জানি না ! তবুও
সর্বত্র এবং যত্রতত্র লিখেছি আমার নাম —
বন্ধুর গ্রামের ভিটায়, পরিত্যক্ত রিক্ত কোনো
হানাবাড়ির সীতলা-পড়া পুরনো ইটায়, বাইজিদ বোস্তামীর
প্রাচীন ঘাটলায়
মধ্যরাতে ঘর-ফেরা একাকী রাস্তায়,
সিনেমার অসংখ্য পোস্টারে, নামকরা নর্তকীর নামের ওপরে
নিদারুণ যত্নে বড়ো বড়ো অবিচল-হস্তাক্ষরে
লিখেছি আমার নাম। লক্ষ্ণৌ-এর একটি অচেনা পাবলিক

ইউরিনালে এবং ট্রেনে যেতে যেতে
একটি নড়বড়ে শৌচাগারে, চাকুরির আবেদনপত্রে,
পানির রেটে, পৈতৃক বাড়িটার বিক্রি হয়ে যাওয়ার দলিলে
লিখেছি আমার নাম। ছেলেবেলার
আনাড়ি হাতের লাল-নীল মোটা পেন্সিলে
দাদীর সফেদ পাড়হীন থানের আঁচলে রেখেছি আমার আঁকাবাঁকা
অপটু স্বাক্ষর। কাবা-শরীফের দিকে মুখ রেখে
আব্বার নিঃশব্দে চলে যাওয়ার পর আম্মার ক্রমশ বেড়ে-ওঠা
বিবর্ণ শাড়ির স্তর বহুবার রাঙিয়েছি আমি
আমারি নামের বর্ণোজ্জ্বল সমারোহে।
এবং তোমার অটোগ্রাফ খাতাটিও ভ'রে দেবো
স্বাক্ষরে-স্বাক্ষরে আমার। কিন্তু কী লাভ !
এখন তো সেই বয়েস যখন
নির্জলা নামের প্রেম খুব শব্দহীনভাবে উবে যায় —
এই নাম দেউলিয়া ! তোমরা কি জানো না
ব্যাঙ্কগুলো ভীষণ বিব্রত : নিয়মিত ফেরৎ পাঠাচ্ছে বারবার
জলহীন নদীর রেখার মতো বিষণ্ন স্বাক্ষরবাহী চেকগুলো আমার !

নর্তক

পাথর তোমার ভেতরেও উদ্বৃত্ত
রয়েছে আর এক নৃত্য ॥

শীতের বাতাস

বাতাস বহে যাও, শীতের বাতাস
নষ্ট হ'য়ে গেছে স্মৃতির শস্য
কবরখানা আজ হ'লো নমস্য
বাতাস বহে যাও শীতের বাতাস

প্রাচীন দেবদারু তোমার দাপটে
নগ্ন ভিক্ষুক দারুণ টলছে
'শুইয়ে দাও তাকে' কে যেন বলছে
বাতাস বহে যাও শীতের বাতাস

একদা বন্ধু হে দয়ালু ঝাপটে
মৃতের কপালের জানি না কি ভুলে
মুছেছো স্বেদকণা কঠিন আঙুলে
বাতাস বহে যাও শীতের বাতাস

আমি কি দেখি নাই ঘূর্ণাবর্তে
হঠাৎ ছিঁড়ে পড়া পালকগুচ্ছ
টিয়ার ঝাঁকগুলো কাদায়, গর্তে
বাতাস বহে যাও শীতের বাতাস

মৃত্যুর প্রাঞ্জল শিল্প

ঘোরলাগা অন্ধকারে মানুষ মৃত্যুর দিকে যাবে,
হরিণের মাংস যায় মানুষের উদরে অমোঘ ;
মাথার ওপরে ঠিক একহাত নেমে এসে, নারী
স্তন খুলে যোনিমূলে মুখ রেখে তোমাকেও খাবে
সভ্যতা, সোনালি সূর্য, সুসময় — ছুরিকা শানানো।
লাল গোলাপের মতো মৃদু খুঁদ খুঁটে–খাওয়া ওই
মোরগের দিকে ছুরির হাতে, বিকেল এগিয়ে গেলে তুমি
— এই দৃশ্য : মৃত্যুর প্রাঞ্জল শিল্প, প্রকাশ্যে বানানো।

কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না

একটি মাছের অবসান ঘটে চিকন বটিতে,
রাত্রির উঠোনে তার আঁশ জ্যোৎস্নার মতো
হেলায়-ফেলায় পড়ে থাকে
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না ;

কবরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করে প্রথম বসন্তের হাওয়া,
মৃতের চোখের কোটরের মধ্যে লাল ঠোঁট নিঃশব্দে ডুবিয়ে বসে আছে
একটা সবুজ টিয়ে,
ফুটপাতে শুয়ে থাকা ন্যাংটো ভিখিরির নাভিমূলে
হীরার কৌটোর মতো টলটল করছে শিশির
এবং পাখির প্রস্রাব ;
সরল গ্রাম্যজন খরগোশ শিকার ক'রে নিপুণ ফিরে আসে
পত্নীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, চুল্লির লাল তাপে
একটি নরম শিশু খরগোশের মাংস দেখে আহ্লাদে লাফায়
সব রাঙা ঘাস স্মৃতির বাইরে পড়ে থাকে
বৃষ্টি ফিরিয়ে আনে তার
প্রথম সহজ রং হেলায়-ফেলায়

কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না,
কোথাও কোনো ক্রন্দন তৈরি হয় না ।

আবুল হাসান একটি উদ্ভিদের নাম

ফেলে-আসা স্টীমারের ভেঁপু, ইলিশ রঙের নদী
আর ভোরের কুয়াশা ছিলো সূর্যাস্তের মতো রাঙা
শোনিতে তোমার, সারাক্ষণ জলের চঞ্চল ধারা ব'য়ে প্রাণে,
চক্‌চকে চিবুক নিয়ে নৌকো আর গলুইয়ের ছায়া
আজীবন চাঁদে-পাওয়া তুমি হেঁটে বেড়ালে রাতের পর রাত

যে-যে রাস্তায় সেখানে পদচ্ছাপ পড়েছিল একদা আমারও,
মুছে গেছে, সেইসব চাঁদ-জ্বলা বিহ্বল রাতের পীচে
তোমার পায়ের চিহ্নগুলো জ্যোৎস্নায় এখনও যায়,
দেখা যায় — শুকোয় নি পুরোপুরি। কিন্তু তুমি ফুল, ফল, পাখি
এবং পুষ্পল ঋতু পার হয়ে চিনেছিলে পার্কের নিঃসঙ্গ বেঞ্চি,

শানানো ছুরির মতো সুহৃদের স্বর, উদ্বাস্তুর মতো এ শহরে
কতটা দুর্লভ এক-আধখানা ঘর এবং যে-কেউ যখন-তখন
ইচ্ছেমতো হ'তে পারে বন্দুকের নল। সবই তুমি জেনেছিলে —
শিল্পেরও ব্যর্থতা (আমি জানি), তবু শব্দের সুতীব্র ডাকাডাকি
ভীষণ চঞ্চুর মতো তোমাকে চেয়েছে খেতে ছিঁড়েখুঁড়ে।

ঘূর্ণিপাকে হঠাৎ ছিটকেপড়া একটি নৌকোর
উচ্ছল উত্থান পতন আগাগোড়া তোমার ভেতরে ছিলো
তাই নিয়ে অত্যন্ত টালমাটাল পায়ে প্রায় বেসামাল
বর্ণোজ্জ্বল এক পালকের নয়নাভিরাম মসৃণতায়
ভেসে থাকলে কিছুকাল এই নিশাকরোজ্জ্বল নিতল শহরে।

তোমার বিভিন্ন রঙ-বেরঙের শার্টগুলো বিজয়ী মাস্তুল হয়ে
নানান ঋতুতে — এমনকি শিস্-দেয়া শীতের হাওয়ায়
উচু হয়ে উঠেছিল সত্তুরের ২১শে ফেব্রুয়ারির রাতে —

রিকশায় আমার পাশে, বরিশালের অজস্র জল ও জিউলি
গাছের ভীষণ জেদী আঠার অসংখ্য কথা বলেছিলে ঝোপে-ঝাড়ে
সারি-সারি গাছে শীতের হাওয়ায় টলে-পড়ার মতন
আঞ্চলিক টানে। তখনই দেখেছি ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে
তোমার মুখের লাবণ্যের বিনিময়। এ শহরে, দীর্ঘ পরবাসে
অবশেষে নিজেকে 'পাথর' ব'লে একদিন চিহ্নিত করেছো বেদনায়
খুব অল্প বয়সেই, জানি। আমি কিন্তু এখনও যে-কোনো

পাথর খণ্ড-চাপা পরিত্রাণকামী সজল উদ্ভিদ দেখে বলি :
'আবুল হাসান, একই শীত-হাওয়া বয় আমাদেরও চিবুকে ও চুলে'।

উত্থান

অবশেষে পড়ে যেতে হয়,
পড়ি, উঠি, পড়ে যাই।

নুয়ে-পড়া একটি গাছের
সমর্থ, সুন্দর ডাল
বন্ধুর হাতের মতো
তবু করমর্দনের
ইচ্ছায় এগিয়ে আসে —

আমি উঠি এবং আবার,
আবার দাঁড়াই, তবু
কিছুতে নিস্তার নেই —
গড়িয়ে-গড়িয়ে নামি।

ছিঁড়ে খায় কাঁটালতা
মেদ-মাংস-মজ্জা-মেধা
তবু খাদের ধারেই
একান্ত অনিচ্ছা নিয়ে
না-দেখে পারি না আর
টেনিস বলের মতো
একটা তরুণ খরগোশ
লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে
আমার বাল্যের মতো।

তাকে নিয়ে লোফালুফি
খেলবে যারা, তারা সব
সারি সারি বল্লমের
ধারালো ফলার মতো

দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন
অপার কৌতুক নিয়ে
হা-খোলা খাদের ধারে —

পড়তে পড়তে আমি দেখি
(না-দেখে পারি না ব'লে)
শাদা ফোয়ারার মতো
একটি খরগোশের
খুব মহান উত্থান।

চাই দীর্ঘ পরমায়ু

যুদ্ধ হত্যা মারী ও মড়ক
তবুও বলি না খিন্ন স্বরে,
'যাক চুলোর ভিতরে যাক এই মরলোক'
হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি নিজের বিবরে
জীবনের নাম শুনে থুতু ছুঁড়ে 'নরক। নরক।'
অনেকেই বলে গ্যালো, আমি শুধু বলি :
নরক তো পিতার শিশ্ন, মায়ের জরায়ু
নরকেই পেতে চাই দীর্ঘ পরমায়ু ॥

একটা দিন

ডাঙায়-ডাঙায় অনেক ঘুরলে
মাছের সঙ্গে একটা দিন
না হয় কিছু জমলো ঋণ

হাওয়ায়-হাওয়ায় অনেক উড়লে
গাছের সঙ্গে একটা দিন
না হয় কিছু জমলো ঋণ

উরু আর নাভি অনেক খুঁড়লে
প্রেমের সঙ্গে একটা দিন
না হয় কিছু জমলো ঋণ

চায়ের ধূসর কাপের মতো রেস্তোরাঁয়-রেস্তোরাঁয়
অনেক ঘুরলাম।
এই লোহা, তামা, পিতল ও পাথরের মধ্যে
আর কতদিন ?

এখন তোমার সঙ্গে ক্ষেত-খামার দেখে বেড়াবো।

যারা গাঁও-গেরামের মানুষ,
তাদের গ্রাম আছে, মসজিদ আছে
সেলাম-প্রণাম আছে।

আমার সেলামগুলো চুরি ক'রে নিয়ে গেছে একজন সমরবিদ,
আমার প্রেমের মূল্য ধ'রে টান মারছে অন্তরঙ্গ বিজ্ঞানী
আমার প্রাণ নিয়ে লোফালুফি করছে কয়েকজন সার্জেন্ট-মেজর
কেবল নিজের ছায়ার কাছে নতজানু হয়ে পড়ে থাকবো আমি
আর কতদিন ?

এখন তোমার সঙ্গে ক্ষেত-খামার দেখে বেড়াবো।

যারা গাঁও-গেরামের মানুষ
তারা তো আমার মতো পাৎলুনের পকেটে হাত রেখে
অহঙ্কারের ভেতর হতশ্রী-হতচ্ছাড়া নয়। তাদের
সোনালি খড়ের ভিটে আছে, গভীর কুয়োতলা আছে
খররৌদ্রে জিরোনোর জন্যে পাথর এবং চত্বর আছে। বটচ্ছায়া ?
সে তো আছেই, বদ্যিবুড়োর মতো আদ্যিকাল থেকে,
আর তাছাড়া সুরপুটি, মৌরলা, ধপধপে চিতল —
এরা তো গ্রামেরই মানুষ !
একবার গ্রাম থেকে আমি পকেট ভর্তি শিউলি

এনেছিলাম (একা একা গন্ধ শুঁকেছি খুব ফিরতি ট্রেনে)। দ্যাখে নি,
না, কেউ দ্যাখে নি — পুকুরের আড়াআড়ি
হাঁটতে গিয়ে আড়চোখে গোলমোরের ডাল — হ্যাঁ তা-ও দেখেছি,
'ও সবে আমার কিছু আসে যায় না হে'
— এখন আর জোর গলায় তা ব'লতে পারি না।

আমি করাত-কলের শব্দ শুনে মানুষ।
আমি জুতোর ভেতর, মোজার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া মানুষ
আমি এবার গাঁও-গেরামে গিয়ে
যদি ট্রেন-ভর্তি শিউলি নিয়ে ফিরি
হে লোহা, তামা, পিতল এবং পাথর
তোমরা আমায় চিনতে পারবে তো হে!

এক চমৎকার রাত্রে

মঈন । একটা চমৎকার গ্রীষ্মের জোনাক-জ্বলা রাত্রে
এই সভ্যতার সকল ধীমান প্রতিনিধিবৃন্দ যদি ম'রে যান
কারো কোনো ক্ষতি হবে না, আমি তা' জানি, তুমিও নিশ্চিত জানো ।
কিংবা হঠাৎ অলিন্দ থেকে
যদি ট'লে প'ড়ে যাই এই আমি এখনি, এখানে
এই সুন্দর রেলিঙ থেকে নিচে, এই উথালপাতাল
বাতাসভরা সন্ধ্যায়, পায়ে মাড়ানো ধুলোট পেভমেন্টে
খুব ক্ষতি হবে কি কোথাও কারো । আমার বদলে
না হয় তুমি-ই ঝাঁপিয়ে পড়লে ফুটপাথে
লোকে বল্‌বে একই কথা — এবং তা' যদি বলে ভুল হবে না মোটেই
সবচেয়ে ভালো সময় এখনই । মঈন । এখনি ।
এই উথালপাতাল বাতাস-ভরা সন্ধ্যায়
এই বারান্দায়
অনেক অনেক রাত দাঁড়িয়ে থেকেছি আমরা দু'জন
মাথায় শিশির নিয়ে
মাঘের ঠাণ্ডায়
অনেক অনেক রাত মুখ রেখেছি হাওয়ায়
আর সেই হাওয়া — ধরা যাক — অনেক গোলাপ বাগান এবং
সজল পুকুর পার হ'য়ে এসে
এই গ্রহের ওপর থেকে আশীর্বাদের মতন প্রবাহিত হ'তে চেয়ে
আমাদের মুখের আঘাতে
থমকে, আহত হ'য়ে, অন্যরকম মাংসল গন্ধ নিয়ে
এলোমেলো, উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেছে

মনে আছে তুমি একবার বিয়ের আসর থেকে
একটি গোলাপ তুলে নিয়ে হাতে,
ঘন্টাখানেকের মধ্যে হাতের তালুতে — হ্যাঁ, তোমার
হাতের তালুতে

বেচারা গোলাপ
মরা একটা পাখির মতো কুঁকড়ে এ্যাত্তোটুকুন হ'য়ে গেল
তোমার ত্বকের তাপ
সহ্য ক'রতে পারে নি ঐ নিটোল পুষ্পখণ্ড
বুঝেছ মঈন ? বুঝতে পারছ ?
তোমার বদলে অন্য কেউ হ'লে এমনটাই হ'তো,
অন্যরকম হতো না কিছুতে, কিছুতেই ...

আমি একবার খাঁচাসুদ্ধ একটি সবুজ টিয়ে কিনে এনেছিলাম,
সেটা বারান্দায় — হ্যাঁ, এই বারান্দা থেকে ঝুলতো
বাতাসে দুলতো
একটু একটু পোষ মানছিল, গানও গাইছিল
অনেক ছোলা সে খেয়েছে আমার হাতে
অনেক অনেক ঘটি পানি
অসংখ্য, অঢেল বুলি তাকে শিখিয়েছি আমি নিজে
আমি, মঈন। হ্যাঁ, আমি
এক প্রবল বৃষ্টির রাত্রে তাকে ঘুরে তুলে আনতে পারি নি,
মনেই পড়ে নি,
সামান্য একটু ভুল
সহ্য ক'রতে পারে নি ঐ নিটোল একফোঁটা ডানা-অলা প্রাণী।
বুঝেছ মঈন ? বুঝতে পারছ ?
আমার বদলে ভুল অন্য কারো হ'লে এমনটাই হ'তো,
অন্যরকম হ'তো না কিছুতে, কিছুতেই ...

এখন বাতাস-ভরা
এই উথালপাতাল উজ্জ্বল সন্ধ্যায়
এই ঠাণ্ডা বারান্দায় হঠাৎ তোমার মনে হ'লো
'ভূগর্ভে, শিলার স্তরে, ধ্বংসস্তূপের তলায়
মানুষের মহৎ মৃত্যুর পর
মহত্তর অস্ত্রগুলো থেকে যায়,
অসংখ্য গোলাপকুঞ্জ ঝলসে গেল — কোথাও সুগন্ধ কোনো
লীন হ'য়ে নেই ; আমাদের অন্যমনস্কতা টের পেয়ে
অন্তত একটি টিয়ে বারান্দার কঠিন মেঝেয়
ট'লে পড়ে গেছে,
তার সবুজাভা এই চরাচরে কখনো দেখি না

কিন্তু অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক কৌটিল্যের চিন্তাগুলো
বুড়ো বটের মতো প্রায় অবিনশ্বর হ'য়ে আছে !'

এইসব কথা আমারও, মঈন, মনে হ'লো —
এসো, আমরা দু'জন একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি
কোনো এক গ্রীষ্মের জোনাক-জ্বলা রাত্রে, চমৎকার হাওয়ায় !
কিন্তু তার আগে এই সভ্যতার সকল ধীমান প্রতিনিধিবৃন্দ যদি
হঠাৎ বাষ্পের মতো উবে যান তবেই গোলাপ, টিয়ে
এবং তাদের আত্মীয়স্বজন ঢের বেশি উপকার পাবে !

কোনো কোনো সকালবেলায়

(মাহমুদুল হক-কে)

টুথব্রাশ, মাজন
চুলে ঠাণ্ডা বাতাস
সকালের,
কমোডে ব'সে
'বাংলাদেশ টাইমস'
অনেকক্ষণ
অনেক
অনেকক্ষণ
কোনো কোনো সকালবেলায়
যে–কোনো খবর পাখির চোখের মতো
জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে (যেন সত্যি সত্যি
এই গ্রহের নিয়তি
আমার হলদে হাওয়াই শার্টের চেয়ে
বেশি মূল্যবান) — লেবাননের নীল জলে

মার্কিন ও ফরাসী রণতরী (সেই সঙ্গে পোল ভেরলেন
ও জাক প্রেভেরের কিছু কবিতা, গীন্সবার্গেরও
ঢুকে পড়তেও তো পারে বৈরুতের
বিপদগ্রস্ত কোনো তরুণ কবির ঘরে — যুদ্ধ তো
বারবার কবিতার পালাবদল ঘটায় — বাস্তব বিপজ্জনক
হ'লে পরাবাস্তবের উৎসবও শুরু হ'য়ে যেতে পারে,
সহজেই এরকম হয়, হ'য়ে থাকে)
কোনো কোনো সকালবেলায়
এরকম মনে হয়,
মনেহয় : যে লোকটা রোজ দুধ নিয়ে আসে
তার তোবড়ানো গালে একটা চুম্বন এঁকে দিই,
যে–কোনো দিনও কবিতা লিখবে না তাকেই 'কবি সম্রাট' আখ্যা দিই,

বন্ধুর ব্যাক জ্যাকেটে
শিউলি ফুলের মতো ছড়িয়ে দিই
কিছু সোনালি মিথ্যে,
যুদ্ধ, হত্যা, মারী, মড়ক, টুথব্রাশ, মাজন — এরা সব
জীবনের জটিল কল্লোল হ'য়ে ওঠে,
মলত্যাগ, মূত্রত্যাগের মতো অকথ্য, উচ্চারণের অযোগ্য ব্যাপারগুলো
জয়গানের মতো মনে হয়,
নিজের মনুষ্যজন্মের জন্যে আর মনস্তাপ থাকে না
কোনো কোনো সকালবেলায়
কোনো কোনো সকালবেলায়
ইচ্ছে হয় সবাইকে ডেকে বলি :
সুপ্রভাত । সালামালেকুম । নমস্তে । গুড মর্নিং, কমরেড ।

যাই, যাই

আজ আবার আমার ইচ্ছে হলো যাই
বর্ধমানে, সেই একটুখানি ইস্টিশনে,
হাই তুলতে তুলতে যাই বটগ্রামে শিউলিতলায়
যেখানে দাঁড়িয়ে আমি কোনোদিন ফটোগ্রাফ তুলি নাই
হে আমার মোরগের চোখের মতন খুব ছেলেবেলা !

চলো তাকে তুলে আনি, তবু বলো
আগে কেন আনি নাই ? অথচ স্বপ্নের মধ্যে
শিউলি-গাছের মতো আমার মা দারুণ সুগন্ধ
সঙ্গে নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে টান দেন কনিষ্ঠ আঙুল।
কপিকলে উঠে-আসা মধ্যাহ্নে কুয়োর ঠাণ্ডা পানি
আমাকে আবার তুলে দ্যায় নতুন শরীর ধ'রে
সেই সুপ্রাচীন সাঁওতাল ! তার ছবি নেই কেন
এ্যালবামে ? সে কি শিমুলের মতো উড়ে
চলে গেছে শালবনে ? কণ্ঠ তার মহুয়ায়
মাদলের বোলে, জন্মে-জন্মে, অন্যকোনো জন্মান্তরে
জাগ্রত হবে না আর ? যদি হয়, আজ তাই
যা কিছু এড়িয়ে গেছি, আড়ালে রেখেছি
আমার নিজের মধ্যে, কবিতার ক্লান্ত শব্দে, বারবার
ফিরিয়ে আনতে চাই। আজ আবার আমার
ইচ্ছে হ'লো যাই, এই রঙ-বেরঙের শার্ট-জামা-জুতো,
মাছ থেকে মাছের আঁশের মতো কৌশলে ছাড়াই ... যাই ...
একটি নতুন নম্র বীজ হ'য়ে, বকুল অথবা
চামেলীর ছদ্মবেশে একেবারে শব্দহীন চলে যাই।

মৎস্য-বিষয়ক

(সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়-কে)

পাখিরা বাতাসে বাস করে।
পাখিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতি আছে।
পাখিরা অন্যান্য পাখিদের দ্বারা সদর্পে সদলবলে
আক্রান্ত হয় কি ? হয়তো বা হয়। হয়তো হয় না। আমরা জানি না।
আমি শুধু জানি আমার ঘরের চেয়ে পাখিদের বাসস্থল
খুব বেশি ছোটো। তাদের জীবন তবু আমার মতন, জানি,
একটি শহরে কিংবা কয়েকটি রেস্তোরাঁয়
কখনো সমাপ্ত নয়।

মাছগুলো জলের অত্যন্ত প্রিয় প্রাণী।
জল মাঝে মাঝে খুব রাগী মানুষের মতো
তাদেরকে ডাঙার ওপর ছুঁড়ে মারে
তবু জল কোনোদিন অতটা শত্রুতা করতে পারে নি, পারবে না।
অথবা এ-কথা সত্য বড় মাছগুলো
নাম-করা বণিকদের মতোই ছোটো মাছদের খেয়ে ফেলে —
হরদম তারা খেতে থাকে।
মৎস্যলোকে মনুষ্যস্বভাব আজও র'য়ে গেছে
যেমন মাছের লেজ, তার স্মৃতি
মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ডাঙার ওপর ঘুরছে ফিরছে
তবু বলি : মাছের মতন কোনোদিন প্রেমিক হবে না
এই আঁশহীন মানুষ এবং মাছেদেরই মতো
ভালো বাস্তু পাবে না সে কোনোদিন এই ডাঙার ওপর।
যতক্ষণ জলের ভেতর থাকে মাছগুলো
বাস্তুর অভাব তারা টের কখনো পায় না —
মনে রেখো, কখনো পাবে না।

মানুষের জয়গান তবু
কোনো কোনো মানুষ গাইতে থাকে সকালে-সন্ধ্যায়, অবেলায়।
আমিও তো চাই জয়গান
মানুষের
তাকে অন্যায় রকম মূল্যবান মনে হয়
ভীষণ মহার্ঘ মনে হয়
তার দখলে সমস্ত ডাঙা
আর সমস্ত ডাঙায় তার গৃহ
সব গৃহেই গৃহ-বিবাদ
সব বিবাদের শেষে দো-নলা বন্দুক।
এরকম সমাধান কারো জানা নেই।
এরকম জয়গান কেউ কোনোদিন শুনবে না।

আর কিছু নয়

চোখ, মুখ, নাক,
এবং আঙুল
কিছু ভুল, কিছু ভুল, শুধু এই
শুধু এই

মসজিদের উঁচু মিনারের রোদ
নেই, নেই, নেই ।
বরং আমার চুল
চিবুক এবং
কিছু ক্রোধ, কিছু ক্রোধ, শুধু এই
শুধু এই

এই-ই আমি দিতে পারি
আর কিছু
নয়
কিছু শ্লোক
এক জোড়া চোখ —
বন্য একগুঁয়ে
কিন্তু স্বপ্নময়
আর কিছু নয়।

পোকা-মাকড় ভরা
বাঁকা-চোরা হৃদয়ের ত্রাস
লুকিয়ে রাখা একটি দীর্ঘশ্বাস
আমার আতঙ্ক, ভয়

এবং সংশয় — এই আমি দিতে পারি। আর কিছু নয়।

খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম

(আবিদ আজাদ-কে)

খুব সাধ ক'রে গিয়েছিলাম গ্রামে — একা,
হ্যাঁ, একাই — তবে এক্কেবারে উদোম একলা নয়,
সব ফক্কিকার ক'রে উড়িয়ে দিয়ে গরীব বালকের মতো
একা যাওয়া যায় না কোথাও ; সঙ্গ নিয়েছিল, সব সময় ছিল
বুড়োটা, সফেদ দাড়ি আর বাবরি চুলের সেই বুড়ো,
জগৎবিখ্যাত বুড়ো। পাতার আড়ালে একচোট
দেখলাম পাখিদের নড়াচড়া স্বীকার করছি
মন্দ, হ্যাঁ নেহাৎ মন্দ নয়) কাপড় শুকোতে দেয়া তারে
কিছু দোল-খাওয়া ফিঙে ? ছিল বৈকি, তা-ও ছিল
সারাক্ষণই ছিল ; তাছাড়া পুরোনো বটগাছ,
ভাঙা দেউল, নেউল, একটি উল্টানো নৌকা এবং জলৌকা
আধ-পেটা ন্যাংটো ছেলেদের উল্টোপাল্টা হঠাৎ সাঁতার
শূন্যে, হাওয়ায় ডিগবাজি, দো-নলা বন্দুক আর
বারবার শিকার, পাখি শিকার —
বাদ রাখি নি কিছুই, মায় কি ডুমুর ফল, ম্লান
খেৎলে যাওয়া, তা-ও দেখলাম উবু হ'য়ে। দুঃখিত হলাম
বিষকাটালির ঝোপ দেখে, সামঞ্জস্য নেই তার নামে আর
নিরীহ আদলে। তবে ভালো লেগেছিল বকুল —
একটি কিশোরী শাদা পাথরবাটিতে কিছুটা বকুল
নিয়ে চলে যাচ্ছিল, ভালোই লাগছিলো।

দো-নলা বন্দুকটার কথা বলা হলো না,
অথচ ওটাই আসল। শিকার করেছিলাম
ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস। দেখলাম গ্রামবাংলার
শাদা-মাটা সরল লোকগুলো ঐ পাখিদের মাংস
খুব পছন্দ ক'রে চেটেপুটে খেলো।

শিকার করেছিলাম আমিই
(হো হতোস্মি !) মুখে রোচে নি মোটেই —
বরং কেমন বিবমিষা পেয়েছিল আমাকে, দারুণ বিবমিষা।
রাত কাটালাম গ্রাম-মোড়লের শাদা ঘরে। আজকাল কুটির-ফুটির
উঠে গিয়ে সব হাভাতেদের একচেটিয়া হয়ে গেছে।
আমিও তো আবাল্য হা-ঘরে
'কুটির' 'কানন' 'নদীতীর' এসবই চেয়েছিলাম। তা যাকগে,
মোড়লের বাসার দেয়াল ছিল পাকা।
অবশ্য সি-আই শিটের ওপর শিশিরের টুপটাপ।
এক্কেবারেই ছিল না তা নয়।
তবু মনে হলো কে যেন কার গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছে, তার শেষ
রক্তবিন্দু পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়।

এমন কি গ্রাম-মোড়লের ট্রাঞ্জিসটারের হাত থেকে
পাই নি রেহাই — মরক্কো, স্প্যানিশ সাহারা, সাঁজোয়া বাহিনী এবং
আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, গাছের মর্মর,
তেপান্তরের মাঠ জুড়ে ভয়ঙ্কর সিগন্যালের মতো
ফস্‌ফরাসের নাচ ! এই সব দেখে দেখে দেখে
আমার স্বপ্নের মধ্যে জ'মে উঠেছিল মরা পাখিদের স্তূপ !
এলোমেলো অসংখ্য পালক !

বালকেরা জানে শুধু

মাছের নিয়মাবলি জানি না
অবশ্য মাছেরা জলে বাস করে
এই কথা আমি জানি, আমার পুত্র ও পুত্রদের বন্ধু
অর্থাৎ মার্বেলপ্রিয় ওই হাফপ্যান্টপরা মূর্খ বালকেরা
জানে : প্রাণীকুলে জলেরাই প্রাণ
কিন্তু মৎস্যকুলে জলের রয়েছে অদ্বিতীয়
সম্মান। এবং মাছেরা জলেই বাস করে।
কিন্তু আমার পুত্র যা জানে এবং মার্বেলপ্রিয়
ওই বালকেরা যা যা জানে, তা তো
জীববিজ্ঞানের মতো শিল্পের যথেচ্ছাচারও
জানে না : জ্যোৎস্নার জলজ্যান্ত রাত্রে
ঝলমলে প্রস্রাবের মতো জ্বলজ্বল করে না তো কেউ
না যৌবন, না স্বর্ণের জটিল জৌলুশ ॥

২.
আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কি
বিশ্বাস করো ঐ লাল, নীল প্রজাপতি
আমাদের সুদূর প্রপিতামহ ? উল্লুকেরা
এমন বিশ্বাসে চলে ফেরে, মধ্যরাতে
ঝোপের আড়ালে ওঁৎ পাতে পুকুরের পাড়ে
পরীদের, ছায়ার, জ্যোৎস্নার, বাতাসের অন্ন বয়স দ্যাখে,
খেলাধুলা দ্যাখে ; উল্লুকেরা, ওই মার্বেলপ্রেমিক বাঁদরেরা
ঠাকুমা'র ঝুলিকেও দারুণ বিশ্বাস করে। তুমিও কি করো ?
আমি তো সুদূর বাল্যে কখনো তা বিশ্বাস করি নি।
কিন্তু কচি গাধাগুলো মনে করে পাখির মতন এ্যারোপ্লেনগুলো
নীলাকাশে
পারমাণবিক বোমা যদি নীরব নিশীথে
গোপনে প্রসব করে — পুকুর-পাড়ের পরী, অলৌকিক পরী

উড়ে গিয়ে লুফে নেবে জলের স্রোতের মতো কোমল আঙুলে।
আমি বিশ্বাস করি না।
ঐ মার্বেলপ্রিয় মূর্খ বালকেরা এখনো বিশ্বাস করে মার্বেলের মতো
বোমাগুলো গড়াতে গড়াতে পরীদের খেলার সামগ্রী হবে।
আমি বিশ্বাস করি না।
ঐ বালকেরা বিশ্বাস করে মহাবিস্ফোরণের পরও
ওদের লাল, নীল, সবুজ মার্বেলগুলো
পরীদের চোখের মতো অখণ্ড অটুট থেকে যাবে !

জীবনের দিকে

বিপ্লব জ্বলে চাঁদের উল্টো পিঠে
বন্যার জলে উঁচু মিনারের মতো
স্তন জ্বলে ঐ শিশ্নশৃঙ্গ জ্বলে
এই দ্যাখো প্রতিবাদ।

তোমার মুখর আঁধারে আমার মুখ
ডিসেম্বরের শীতেও কী উন্মুখ
ওল্টানো চাঁদ, বিপরীত রতি তার
এই দ্যাখো নির্মাণ।

ভস্মাবশেষ পার হ'য়ে কালো হাত
নদীর শাদায় ছিপ-নৌকোর মতো
গোড়ালি পেরিয়ে উরুতে কম্পমান
এই তো আমার বিশ্ব পর্যটন।

জরায়ুতে তার দারুণ বন্য বেগে
কালো রাত্রির সফেদ অশ্বারোহী
নেচে ওঠে যেনো তাল-মান-ছেঁড়া লয়ে
এই দ্যাখো ফের উজ্জ্বল উত্থান।

মানুষ, মানুষ

(ইকবাল হাসান-কে)

শেষ পর্যন্ত লাফিয়ে প'ড়লো এঁদোকুয়োর ভেতর
আমার প্রথম প্রিয়, কবিতা-পাগল, সেই একাকী মানুষ ;
আরজন (দূর সম্পর্কে ভাই-ও বটে) বিষাদের অতলান্ত ছোঁয়া
নিঃসঙ্গ অনুজ, পবনহীন পাগলা-গারদের শিকে বহুকাল
দাঁড়িয়ে রয়েছে নিজমনে, তার চোখ
নক্ষত্রের মতোই জ্বলছে — ঠিক নক্ষত্রের মতোই সীমাহীন
শূন্যের ভেতর — মোম কিংবা কুপির চেয়েও অনেক গরিব।
অন্যজন (আমার কৈশোর-সঙ্গী) অন্ত্রের ভেতর এক
অম্ল-জটিল ঘা পুষে : 'ডাক্তারের হাঁকডাকে আস্থা নেই,
মদিরা অন্তিম লক্ষ্য, মাংস ধ্রুবতারা !' — এরকম কিছু
চমৎকার সমকালীন ও তীব্র কথা ব'লে বুড়ো পৃথিবীর
নাড়িভুঁড়ি খেতে চলে গেছে পৃথিবীরই অত্যন্ত গভীর অভ্যন্তরে।
আরেক উজ্জ্বল সমকামী (এ শহরে) পুরুষ-বেশ্যার অফুরন্ত
অশেষ অভাব টের পেয়ে ঘুরে বেড়ায় শীত-প্রধান দেশে
সারাক্ষণ কেবল আইনানুগ, উষ্ণ সমকাম চেয়ে-চেয়ে ;
অথচ আমারই চেতনার রঙে পান্না হয়ে ওঠে দারুণ সবুজ
আমি গাইতে বল্‌লেই ওস্তাদেরা ইমন কল্যাণ গেয়ে ওঠে :
'এই ঝোড়ো যুগে, অশান্ত হাওয়ায়' — কেউ বলে 'একমাত্র
তুমিই ব্যতিক্রম, উদ্ধত স্বাস্থ্যের অধিকারী, একাকী, অটুট'
আমি বলি : 'এই স্বাস্থ্য আমার, এবং এর ধার, ঠিক সেই
ডাক্তারের মতো নিজের ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয়ের সুচিকিৎসা জানা নেই যার।'

এ-ও সঙ্গীত

শেল্ফের ভেতরে বইগুলো যথেষ্ট হয় না মনে
কোন-কোন রাত্রিতে। রেকর্ড প্লেয়ারের জন্যে
অনুচ্চারিত প্রার্থনার মতো মৃদু বাতাস হঠাৎ
পর্দার চৌদিকে নড়েচড়ে ... কেউ যেন গান ...

'আমাকে একটি গান' অর্ধস্ফুট ছায়াচ্ছন্ন স্বরে
আমাকেই বলে, 'তোমার রেকর্ড নেই,
রেকর্ড প্লেয়ার নেই যাতে হৃদয় সোনালি পয়সার মতো
বেজে ওঠে, উঠতে পারে। অন্তত সফ্‌ট সঙ্গীতে
ভরা একটি ক্যাসেট থাকলেও দোষ নেই কোন — '

'গান, গান ছাড়া একদণ্ড চলে না আমার,
যে-ঘরে কখনও গান নেই, কোন গান নেই, তাকে
মনে হয় নিরর্থক গুল্মলতা ঠাসা সোনালি মাছের
একটি বিহ্বল এ্যাকুরিয়াম, মাছগুলো নেই,
এমন কি কফিনের সঙ্গেও তুলনীয় মনে হয় কখনো বা।'

'কিন্তু রেকর্ড-প্লেয়ার অথবা ক্যাসেট কিংবা রেডিওর
সে নব-ঘোরানো মাঝরাতের ডায়াল থেকে আগন্তুক
সঙ্গীত ছাড়াও গান আছে —, ' আমি বলি, 'গান কিংবা
সঙ্গীত কেবল গুণীর গলায় কিংবা গীটারের তারে
তোমার আঙুল নয় ; সঙ্গীতের জন্যে তোমার এই সোনালি

হাহাকার তালে-লয়ে ঐশ্বর্যবান একটি গানের অনুভব
তৈরি করে দেয় আমার ভিতর।' যদি আমি বলি,
'গান কিংবা সঙ্গীত আসলে একটি অনুভব, ঠিক
ধ্বনি বা ধ্বনিতরঙ্গের সংঘাত নয় (যদিও সংঘাত
সুদূর পশ্চিমে মূলকথা, তবু অনুভবই মুখ্য)',

'দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি : কারুকাজে-ভরা শাড়ির ভেতর থেকে
তোমার নগ্নতা কোন-কোন রাত্রে জ্বলজ্বলে সরোদের মতো
উন্মোচিত হয়, জলদ-গম্ভীর কিছু ঝংকার আমার
শোণিতে, শিরায় অনুভব করি — এও তো সঙ্গীত — ।'

"বাইরে যখন বৃষ্টি, আমি ঘরে নেই, তুমি
কোলের ওপর একগুচ্ছ পাতার মতো হাত জড়ো ক'রে
স্মৃতিভারাক্রান্ত হয়ে বসে আছো—এও তো সঙ্গীত — !"

"অন্য একদিন : মধুপুরে, ডাক-বাংলো থেকে দেখলাম
গ্রীষ্মের গম্ভীর এক শব্দহীন দুপুরে ছ'ফুট উঁচু ঘাসে
বাতাস একটা বাঘের মতন নড়ছে-চড়ছে — এও তো সঙ্গীত — ।'

'আমার ঘর রেকর্ড-প্লেয়ারহীন বটে, কিন্তু আমার অস্তিত্ব
গান শূন্য নয় ; কেবল লতায় আর গুল্মে-ঠাসা
এ এ্যাকুরিয়ামে মাছ নেই — এ-ও সত্য নয় পুরোপুরি —
আমাদের ভালোবাসার প্রাক্তন প্রহরগুলো আমার কামরার জলে
লাল, নীল, সোনালি মাছের মতো লেজ তুলে ঘুরছে, প্রিয়তমা।
এবং এ-ও সঙ্গীত !'

একটি ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের জার্নাল

১২ই নভেম্বর, ১৯৭০
এতসব ছদ্মবেশ আছে চৌদিকে, আজন্ম উন্মূল মানুষ
ভেবেছে তারও ঘর আছে, নিকেতনে ভ'রে আছে সমস্ত নিসর্গ
দুধ-সরোবর ব'লে ভেবেছে সে স্বপ্নগ্রস্ত চোখে দূর থেকে
অতল খাদের পর কুয়াশার নিস্তরঙ্গ নিরস্ত্র বিস্তার।
তাই সে বেঁধেছে ঘর সন্ধ্যার পাখির স্বরে, চুপিচুপি
চুরি ক'রে ঢুকে গেছে শিশিরের টলটলে ফোঁটার ভেতর
জ্যোৎস্নাকে করোগেট শিট ভেবে প্রাণদাত্রী নদীর নিক্কণে
তার সব নিরাপত্তা জমা আছে ভেবে বন্দনায় কণ্ঠ ছিঁড়েছে।

রাত্রে গাছের পাতায় আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে
খুচরো পয়সার মতো ছড়ানো জ্যোৎস্নারাজি দেখে
ভিক্ষুকের মতো বারবার আমিও দাঁড়িয়েছি
হাতের রুক্ষ তালু প্রসারিত ক'রে

দেখেছি উদ্বাহু আত্মীয়ের নৃত্য
সমুদ্রের ডুগডুগি শুনে
আমি তাই বহুবার ভেবেছি
আমার বুভুক্ষা
হয়তো মেটাতে পারে কোন ইন্দ্রধনু
কিংবা রাত্রে শাদা কুয়াশায় মোড়া
সেবাপরায়ণ গাছগুলো নিপুণ নার্সের মতো
দাঁড়াবে মাথার কাছে
ওষুধের ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু
প্রতিশ্রুতিশীল শিশির গলাধঃকরণ ক'রে
নিন্দ যাবো নিশ্চিন্তে নিশীথে।

আজীবন লোকালয় থেকে আমি
পালাতে চেয়েছি — অন্ধকারে টর্চের আলোর চেয়েও

নির্ভরযোগ্য ভেবে জ্যোতিষ্মান পুষ্পরাজিকে,
মেধার চেয়ে অধিক মেধাবী ব'লে জেনেছি জ্যোৎস্নাকে।

জানি নিসর্গ এক নিপুণ জেলে
কখনো গোধূলির হাওয়া, নিস্তরঙ্গ জ্যোৎস্নার ফাঁদ পেতে রাখে,

তার অলৌকিক বড়শি থেকে ঝোলে পাখি, দোলে মেঘ
কোমল আহ্বানে উন্মুখ হয়ে যায়
কখনো নিশীথ আসে নিঃশব্দে নিশির মতো
বড়ো অন্তরঙ্গের মতো কড়া নাড়ে
বন্ধুর আজন্ম চেনা কণ্ঠস্বরের ডাক শুনে যে যায়
সে জানি দাঁড়ায় না আর
তাল তাল কাদার মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকে, একগুঁয়ে, বেসামাল।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৭০
নিসর্গ সেদিন তার ছদ্মবেশ খুলেছিল
একে একে সব অলংকার সে ফেলেছে,
যেমন রাজর্ষি যুবা প্ররোচিত হবার পর
বিয়ের সোনালি খাট থেকে হঠাৎ সভয়ে দ্যাখে
রক্ত-মাংসভুক ডাইনী এক তার প্রিয় প্রাসাদ জুড়ে
নর্তনে-কুর্দনে মেতে সব গয়না পরিত্যাগ করেছে।

নিসর্গ আবার তার মোহন ছদ্মবেশ পরেছে।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৭০
আমি তো শোকগ্রস্ত নই, সকালের প্রথম প্রস্থ চা
প্রথামতো ভিজিয়েছে রুক্ষ গলা ; গতকালের জলোচ্ছ্বাস বিধৃত
পত্রিকা দলা দলা হয়ে পড়ে আছে, হাতে আজকের কাগজ
ঠোঁটে চায়ের পেয়ালা, চোখে মৃত্যুর টাটকা ফটোগ্রাফ,
মনে : উপকূলবাসী নই বলে আশ্চর্য নিরাপত্তা !

চারদিকে চেয়ে দেখি সবকিছু ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে রয়েছে
যে যার ভূমিকায় — কোট ঝুলছে আলনা থেকে
আমার দেহের জন্যে সদ্য পাড় ভাঙা শার্ট আলিঙ্গন উন্মুক্ত করেছে
বেসিন থেকে উড়ে গিয়ে বাসি ব্লেড প্রজাপতির ছদ্মবেশ পরে নি
গর্জন করছে না পোষমানা শহরে প্রকৃতি খাঁচায় পোরা কোন
বাঘের মতোন।

আমি তো শোকগ্রস্ত নই, বঙ্গোপসাগরের নোনা পানি
আমার ক'ড়ে আঙুলও ছোঁয় নি, এমনকি ভেজাতে পারে নি
পা-জামার প্রান্তদেশ আর তা'ছাড়া চতুর্দিকে
(পৌর সমিতিকে ধন্যবাদ !) ঝোড়ো রাতের আশ্রয়ের আশ্বাস নিয়ে
খণ্ড খণ্ড দ্বীপের মতো জেগে আছে অজস্র ফুটপাত ।

আমি তো শোকগ্রস্ত নই, টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালে
প্রত্যেকে উত্তর দিচ্ছে যে যার নিজের ঘরে সুস্থ স্বাভাবিক।
তবু শোকের প্রস্তাব চারদিকে, জীবিতের মুখ যেন
মিশে গেছে মৃতের আদলে, শবযাত্রার মতো গম্ভীর মিছিলে
ছেয়ে গেলো আমার শহর, ভ'রে গেলো বঙ্গোপসাগরের গর্জনে।

২২শে নভেম্বর, ১৯৭০
শহরের রেস্তোরাঁগুলো নিজেদের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ে নি
দোকান-পাট উন্মুক্ত খোলা, মানবিক অহঙ্কারে মোড়া
ডি-আই-টি'র চূড়া মধ্যসমুদ্রে লাইট-হাউসের মতো
আমাদের ঝোড়ো জাহাজটিকে দেখাচ্ছে পথ
ট্র্যাফিক আইল্যাণ্ডে পুলিশ যেন নৌকোর পালের মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচু হ'য়ে।
আর রাস্তার নেমপ্লেটগুলো কম্পাসের মতো মূল্যবান, ঝকঝকে।
চতুর্দিকে সব ঠিকঠাক এখনও রয়েছে,
এখনও শোকগ্রস্ত হই নি আমি, দেরাজ খুলি,
দেখি কাতারে কাতারে শুয়ে আছে মৃত শিশু
হাতের মুঠোর মধ্যে ন্যাপথলিন লাশের চোখের মতো শাদা
তাকিয়ে রয়েছে অপলক যেন আমার দিকেই
শরীরে জড়ানো র‍্যাপার আমুণ্ডু গিলেছে আমাকে

নির্বিবেকী কাফনের মতো
আর আমার ওয়ার্ডরোব থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসছে
আমারই কাপড়-চোপড় ফুলে যাওয়া লাশের মতো
যেখানেই হাত রাখি সবকিছু মৃতের দেহের মতো
শীতল, ঠাণ্ডা, হিম
ফ্রিজের হাতল, নিজেকে দেখার আর্শি, ক্ষুরের শক্ত কাঠ
সবকিছুই ঠাণ্ডা, তুহিন।
মাথার ওপরে আবর্তিত পাখা শকুনের ছদ্মবেশে

উতরোল উৎসবে মেতেছে
এখনও চতুর্দিকে ঠিকঠাক সবকিছু
অথচ গেলাসের জলে বিন্দু বিন্দু ঘূর্ণিতে
স্বজনের চেনা মুখগুলো ভাসছে লাশ হ'য়ে
কোথায় পালাবো, বলো, কার দ্বীপে, কোন ফুটপাতে
একটি বোটের মতো প্রিয়তম রেস্তোরাঁটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে
প'ড়ে আছে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে।

ধূসর জল থেকে

(হাফিজুর রহমান-কে)

এই ভুবনেই জানাশোনা
বিবসনা
কোথাও না কোথাও ঠিক আছে
নিজস্ব শিউলী আর চন্দ্রমল্লিকার কাছে
কোথাও না কোথাও ঠিক আছে
নদীর ওপারে
তার বাড়ি
মধ্যে তার দারুণ ধূসর জল ব'য়ে যায় আড়াআড়ি
নদীর ওপারে
তার বাড়ি
পালের সঙ্গে তার আড়ি
চারিদিকে মোহনা ও খাড়ি
এ ভুবনেই
সে যে আছে
তাই আমার খামার ফেলে আমি
ধূসর এ জলে এসে নামি
রাঙা ঐ জলে যাবো ব'লে
ধূসর জল থেকে রাঙা জলে
ধূসর জল থেকে রাঙা জলে ॥

বোধ

(মাহবুব হাসান-কে)

শালিক নাচে টেলিগ্রাফের তারে,
কাঁঠালগাছের হাতের মাপের পাতা
পুকুর পাড়ে ঝোপের ওপর আলোর হেলাফেলা
এই এলো আশ্বিন,
আমার শূন্য হলো দিন
কেন শূন্য হলো দিন ?

মহাশ্বেতা মেঘের ধারে-ধারে
আকাশ আপন ইন্দ্রনীলের ঝলক পাঠায় কাকে ?
ছাদে-ছাদে বাতাস ভাঙে রাঙা বৌ-এর খোঁপা
এই এলো আশ্বিন,
আমার শূন্য হলো দিন
কেন শূন্য হলো দিন ?

শিউলি কবে ঝরেছিলো কাদের আঙিনায়
নওল-কিশোর ছেলেবেলার গন্ধ মনে আছে ?
তরুণ হাতের বিলি করা নিষিদ্ধ সব ইস্তেহারের মতো

ব্যতিব্যস্ত মস্তো শহর জুড়ে
এই এলো আশ্বিন,
আমার শূন্য হলো দিন
কেন শূন্য হলো দিন ?

একটি উত্থান-পতনের গল্প

আমার বাবা প্রথমে ছিলেন একজন
শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সম্পাদক
তারপর হলেন এক
জাঁদরেল অফিসার ;
তিনি স্বপ্নের ভেতর
টাকা নিয়ে লোফালুফি খেলতেন
টাকা নিয়ে,
আমি তাঁর ছেলে প্রথমে হলাম বেকার,
তারপর বেল্লিক
তারপর বেকুব
এখন লিখি কবিতা
আমি স্বপ্নের ভেতর
নক্ষত্র নিয়ে লোফালুফি করি
নক্ষত্র নিয়ে ;
বাবা ছিলেন উজ্জ্বল, ধবধবে ফর্শা
এবং ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা
আমি তাঁর ছেলে — ময়লা, রোদে-পোড়া, কালো
৫ ফুট ৯ ইঞ্চি মোটে (অর্থাৎ
পাঁচ ইঞ্চি বেঁটে)
বাবা উন্নত-নাসা
পরতেন প্যাঁসনে
আমার নাকই নেই বলতে গেলে
পরি হ্যাণ্ডেল-অলা চশমা
বাবা জানতেন দুর্দান্ত ইংরিজি
আমি অল্পস্বল্প বাংলা
বাবা যখন-তখন যাকে-তাকে চপেটাঘাত করতে পারতেন।
আমি কেবল মাঝে-মধ্যে একে-ওকে চুম্বন ছুঁড়ে মারতে পারি, ব্যাস।
প্রবল বর্ষার দিনে বাবা

রাস্তায় জলোচ্ছ্বাস তুলে স্টুডিবেকারে ঘরে ফিরতেন,
আমি পাতলুন গুটিয়ে স্যাণ্ডেল হাতে
অনেক খানাখন্দে পা রেখে এভিনিউ পার হ'তে চেষ্টা করি
বাবার নাম খালেদ-ইবনে-আহ্‌মাদ কাদরী
যেন দামেস্কে তৈরি কারুকাজ-করা একটি বিশাল ভারী তরবারি,
যেন বৃটিশ আমলের এখনও-নির্ভরযোগ্য কোনো
ঝনঝন ক'রে-ওঠা ধাতব ওভারব্রীজ,
আমার নাম খুব হ্রস্ব
আমার নাম শহীদ কাদরী
ছোটো, বেঁটে — ঝোড়ো নদীতে
কাগজের নৌকোর মতোই পল্‌কা
কাগজের নৌকোর মতোই পল্‌কা।

দাঁড়াও আমি আসছি

তুমি ছিপ হাতে নৌকোতে ব'সে আছো,
নদীর অন্যপারে সর্ষে ও মটরশুঁটির মুখ
আমি কখনো দেখি নি,
তার টানে, তারই টানে-টানে
ভেসে চ'লে গেছি মাঝনদীতে একাকী খেলাচ্ছলে,
দুই তীর থেকেই সমান দূরে
এখন আমাকে ব'লে দাও
আমি কোন্‌দিকে যাবো — দুই দিকেই প্রবল টান
আমার ; হ্যাঁ, এই, চিরকাল
এমনটাই হ'লো
এমনি ক'রেই ডাঙার ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে আমার বসবাস
কোনোদিনও হ'লো না,
তরমুজ ক্ষেতের ওপারে আমার কোনো আটচালা নেই
অথচ দু'ধারে আছে সারি-সারি
হীরার পাতের মতো জ্ব'লে-ওঠা তোমাদের নিজস্ব
করোগেট, টোম্যাটোর লাল !

অথচ আমাকে দ্যাখো, আমি
তার টানে, তারই টানে-টানে
ভেসে চ'লে গেছি মাঝনদীতে একাকী খেলাচ্ছলে
চোরা ঘূর্ণির ভেতরে,
এখন আমি কোনোদিকেই আর যেতে পারছি না
সে কোন্ সকাল থেকে শুরু হয়েছে আমার অঙ্গভঙ্গি
আমার ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার,
উবু-সাঁতার, মৃদু-সাঁতার, মরা-সাঁতার, বাঁচা-সাঁতার
হ্যাঁ, সত্যি। সাঁতার দিতে-দিতেই আমার যেন বয়োবৃদ্ধি হ'লো,
জলের ওপর আমার কৈশোর, আমার যৌবন
কচুরিপানার মতো ভেসে

বেড়াচ্ছে কী দারুণ সবুজ।
এ-ভাবে জলে-জলে-জলে
জল থেকে জলে কতক্ষণ
হে পানসি হে ডিঙি-নৌকো হে যাত্রীবাহী লঞ্চ
আমাকে কি দেখতে পাচ্ছো না ?

মাঝনদীতে যাত্রাপার্টির সঙের মতো
এই রঙঢঙ আর
ভাল্লাগছে না (বয়স তো হ'লো) চুলে পাক,
মেরুদণ্ড শিথিল,
বাহু বিফুল, চোখ ঝাপসা
হঠাৎ দেখছি জলে
তুমিও আমার মতো জলে, জল থেকে জলে,
জলে-জলে-জলে
খেলাচ্ছলে এসেছো কি তুমিও, তুমিও ?
কিন্তু এই ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার,
উবু-সাঁতার, মৃদু-সাঁতার, মরা-সাঁতার, বাঁচা-সাঁতার
এ-সব জানা আছে তো ? তবে খামোকা এসেছো
কেন — কেন, কেন ? এখন তোমার
সব দায়-দায়িত্ব আমাকে নিয়ে নিতে হবে, হবেই —
আমি তখনি বলেছি সকালের ফুটো নৌকো
দুপুরে ঝাঁঝরা হবে, যখন সাঁতারই জানো না
মাছ-ধরার ফালতু শখ
কিছুতে ক'রো না, এখন কে সামলাবে ঠেলা ?
অবহেলা আমার ধাতে নই, এ-কথা জেনেই
অবেলায় ডুবেছো, মাথার ওপরে সূর্য
পশ্চিমে হেলান দিয়ে ব'সে আছেন বাদশার মতো।
একটু পরেই রাত, তারপর জল
আপন ঠাণ্ডা করাত দিয়ে ফালি-ফালি
কাটবে দু'জনকে
মনে পড়বে আত্মীয়স্বজনকে, যারা, ঘুমে আত্মহারা
নতুন করোগেটের নিচে, এখন মিছে -
মিছি কপালে চপেটাঘাত ক'রে লাভ নেই,

দাঁড়াও, আমি আসছি
তোমাকে চাই ভাসতে-ভাসতে
ডুবতে-ডুবতে,
ডুবে যেতে-যেতে আমার
তোমাকে চাই

দাঁড়াও, আমি আসছি ...